বিদ্যাসাগর

বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারীপ্রগতি

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালা]

ভারততত্ত্ব-ভাস্কর

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-এইচ্-ডি, ডি-লিট.

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

উৎসর্গ

সুদীর্ঘ জীবনের সুখে দুঃখে চিরসহচরী,
পতিপ্রাণা, সেবাপরায়ণা, ধর্মশীলা,
ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্ম-নিবেদিতা,
পুণ্যক্ষণে স্বর্গগতা,
সতী, সাধ্বী, সহধর্মিণী,
৺প্রিয়বালা দেবীর
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে
শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন
এই অর্ঘ্য নিবেদন করিলাম।

—গ্রন্থকার

ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসবঃ।
গতমাভরণপ্রয়োজনং পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে॥
গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥
বিভবেঽপি সতি ত্বয়া বিনা সুখমেতাবদজস্য গণ্যতাম্।
অহৃতস্য বিলোভনান্তরৈর্মম সর্বে বিষয়া ত্বদাশ্রয়াঃ॥

ভূমিকা

১৯২৭ সনের জুলাই মাসের মধ্যভাগে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯২৬ সনের 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতা' দিবার জন্য আমন্ত্রিত হই। নিয়মানুসারে মোট পাঁচটি বক্তৃতা, এবং ইহার মধ্যে অন্তত: একটি ২৯শে জুলাই বিদ্যাসাগরের মৃত্যু বার্ষিকী দিবসে দিবার কথা। দশ বারো দিনের মধ্যে পাঁচটি বক্তৃতা লেখা অসম্ভব—সুতরাং আমি প্রস্তাব করিলাম যে, প্রথম বক্তৃতাটি ২৯শে জুলাই দিব, কিন্তু বাকী চারিটির জন্য পাঁচ-ছয় মাস পরে দিন স্থির করা যাইবে।

এই ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন করিলেন। তখন আমার মনে হইল যে যদি কোনও একটি বিষয় অবলম্বন করিয়াই পাঁচটি বক্তৃতা দেই, তাহা হইলে প্রথম ও অবশিষ্ট চারিটি বক্তৃতার মধ্যে এত ব্যবধান হইবে যে, শ্রোতাদের পক্ষে বিষয়বস্তুর সম্বন্ধ ও পারম্পর্য স্মরণ রাখা দুরূহ হইতে পারে। সুতরাং প্রথম বক্তৃতাটি স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং অবশিষ্ট চারিটি কোন একটি বিষয় অবলম্বনে হইবে, ইহাই সঙ্গত মনে হইল। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দুইটি প্রধান কৃতিত্ব—বাংলা গদ্য ভাষার ও স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নয়ন। সুতরাং আমি স্থির করিলাম যে, প্রথম বক্তৃতায় বিদ্যাসাগরের সময় পর্যন্ত বাংলা গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং বাকী চারিটিতে হিন্দু সমাজে নারীজাতির অবস্থার বিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই পরিকল্পনা অনুসারে আমি নিম্নলিখিত পাঁচটি বক্তৃতা দেই :

১। বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব

২। ঋগ্বেদের যুগে ভারতীয় নারী

৩। স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে ভারতীয় নারী

৪। মধ্যযুগে বঙ্গনারী

৫। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গনারী

এই পাঁচটি বক্তৃতা একত্রে প্রকাশিত হইল। সময়ের অভাবে মৌখিক বক্তৃতায় লিখিত অংশের কিছু বাদ দিতে হইয়াছিল। তাহা এবং কয়েকটি পাদটীকা বর্তমান গ্রন্থে যোগ করিয়াছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া আমাকে যে সম্মান দিয়াছেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স কর্তৃক এই বক্তৃতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। আমি তাহা-দিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

২৪. ৬. ৬৯

সূচীপত্র

প্রথম বক্তৃতা—বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব … … ১

দ্বিতীয় বক্তৃতা—ঋগ্বেদের যুগে ভারতীয় নারী … … ২৮

তৃতীয় বক্তৃতা—স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে ভারতীয় নারী … ৫২

চতুর্থ বক্তৃতা —মধ্যযুগে বঙ্গনারী … … ৭৫

পঞ্চম বক্তৃতা—ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গনারী … … ১০৩

নির্দেশিকা … … … ১৪১

প্রথম বক্তৃতা

বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব

আজ প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু দিবস। তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর পাঁচটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। এই বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে যে সম্মান দিয়াছেন, তাহার জন্য ইহার কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। মাত্র পনর দিন পূর্বে আমি এক পত্রে এই আমন্ত্রণের আভাস পাই। এই পত্রে নির্দেশ ছিল যে পাঁচটি বক্তৃতার মধ্যে অন্ততঃ একটি বক্তৃতা ৺বিদ্যাসাগরের মৃত্যু দিবস ২৯শে জুলাই তারিখে দিতে হইবে। পনর দিনের মধ্যে পাঁচটি বক্তৃতা তো দূরের কথা একটি বক্তৃতাও প্রস্তুত করা কষ্টকর। কিন্তু চিরাচরিত রীতি পালন করিবার জন্য আমি আজিকার এই পুণ্য তিথিতে আমার প্রথম বক্তৃতাটি আপনাদের কাছে নিবেদন করিব। বাকি চারিটি বক্তৃতা প্রস্তুত করিতে সময় লাগিবে—আগামী পূজার ছুটির পূর্বে ইহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে যে বক্তৃতা করিব তাহার সহিত আজিকার বক্তৃতার বিষয়বস্তুর যোগাযোগ রক্ষা করা শ্রোতাদের দিক হইতে সম্ভব হইবে না—কারণ ততদিনে ইহার সম্বন্ধে কোন স্মৃতিই হয়ত তাহাদের মনে থাকিবে না। এইজন্য প্রথম ও অবশিষ্ট চারিটি বক্তৃতার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ পৃথক-রূপেই পরিকল্পনা করিয়াছি। যে দুইটি বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন আমি এই দুই পর্যায়ের বক্তৃতায় তাহাই আলোচনা করিব। বিদ্যাসাগরের প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বাংলা গদ্য সাহিত্যের বর্তমান রূপায়ণ। তাঁহার কর্মজীবনের

প্রধান কীর্তি—সমাজ সংস্কার, বিশেষভাবে স্ত্রী জাতির অবস্থার উন্নতি। আমার আজিকার বক্তৃতার বিষয় বিদ্যাসাগরের সময় পর্যন্ত বাংলা গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশ। পরবর্তী চারিটি বক্তৃতাতে বিভিন্ন যুগে ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা এবং মানসিক প্রগতির সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বর্তমান কালে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করিলে ইহা কল্পনা করা খুবই কষ্টকর যে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে অর্থাৎ আমার মত আজিকার বৃদ্ধদের জন্মের মাত্র এক শত বৎসর আগেও বাংলা গদ্য সাহিত্যের অস্তিত্বই ছিল না। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বেও বাংলার পদ্য সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল এবং চণ্ডীদাসের পদাবলী আজিও তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। মানুষ জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যাপারে এবং পরস্পরের সহিত ভাব ও চিন্তার বিনিময়ে গদ্য ভাষারই ব্যবহার করে। কেহ সাধারণতঃ পদ্যে কথাবার্তা বলে ইহা ভাবিতেও আমাদের মনে হাস্যের উদ্রেক হয়। সুতরাং গদ্য সাহিত্যই যে প্রথমে উৎকর্ষ লাভ করিবে ইহা মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু কার্যতঃ তাহা হয় নাই। বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন চর্যাপদগুলিতে প্রায় সহস্র বৎসর অথবা তাহারও পূর্বে রচিত বাংলা পদ্যের নমুনা পাওয়া যায়। তাহার পর দ্রুতবেগে এই পদ্য সাহিত্যের ক্রমশঃ উন্নতি হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী বা তাহার পূর্বে রচিত চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনার মধ্যে অন্ততঃ শতাধিক উৎকৃষ্ট বাংলা কাব্য গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

অথচ এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাংলা গদ্যে এমন একখানি গ্রন্থও লিখিত হয় নাই যাহা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইলেও সাহিত্যপদবাচ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। ইহার প্রমাণস্বরূপ প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত রমাই পণ্ডিত রচিত "শূন্যপুরাণ" পদ্যে রচিত, কিন্তু এই গ্রন্থে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত কয়েকটি গদ্যে লিখিত বাক্য আছে। ইহার মধ্যে 'বারমাসি' নামক রচনাটি প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ মনে করেন ইহা ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। কিন্তু কোন বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবসর আছে। শূন্যপুরাণের আর একখানি পুঁথি ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত ও বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতেও অনুরূপ কয়েকটী গদ্য বাক্য আছে। নমুনাস্বরূপ এই প্রাচীনতম গদ্যের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"কোন মাসে কোন রাশি। চৈত্র মাসে মীন রাশি। হে কালিন্দী জল বার ভাই বার আদিত্ত। হথ্থ পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি। সেবক হব সুখি আমনি ধীমাৎ কন্নি। গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি।'

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাঙ্কেতিক রচনা বাদ দিলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বা তাহার পূর্বে রচিত কোন বাংলা গদ্যের অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। "চৈত্যরূপপ্রাপ্তি" নামক গ্রন্থ কবি চণ্ডীদাস রচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন—কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই। ইহার যে পুঁথি পাওয়া যায় তাহা ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। ইহার ভাষা যে এই তারিখের বহু পূর্বে প্রচলিত ছিল ইহার কোন প্রমাণ নাই। ইহার একটু নমুনা দিতেছি ঃ

"চৈত্যরূপের রা চ অধরূপ লাড়ি। রা অক্ষরে রাগ লাড়ি। চ অক্ষরে চেতনা লাড়ি। র এতে চ মিশিল। রা এতে বসিল। ইহা এক অঙ্গা লাড়ি।"[১] ইহা তান্ত্রিক উপাসনার কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র।

"রূপ গোস্বামীর কারিকা" নামে পরিচিত একখানি গদ্য গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। রূপ গোস্বামী চৈতন্যের সমসাময়িক সুতরাং ইহার

ভাষা ষোড়শ শতাব্দীর ভাষার নমুনা স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ গন্ধ-গুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শগুণ এই পাঁচগুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতী রাধিকাতেও বসে। শব্দগুণ কর্ণে গন্ধগুণ নাসাতে রূপগুণ নেত্রে রসগুণ অধরে ও স্পর্শগুণ অঙ্গে। এই পঞ্চগুণে পুর্বরাগের উদয়। পুর্বরাগের মূল দুই, হঠাৎ শ্রবণ ও অকস্মাৎ শ্রবণ।"[২]

দীনেশচন্দ্র সেন এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন: "প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বের বাঙ্গালা গদ্য বেশ প্রাঞ্জল ও গুরুতর বিষয় রচনার সর্বতোভাবে উপযোগী ছিল বলিয়া বোধ হয়।" এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা খুবই কঠিন। কারণ উদ্ধৃত পদ কয়টি সংজ্ঞা মাত্র—ইহাতে সাহিত্য রসের কোন সন্ধান. মিলে না।

"জ্ঞানাদি সাধনা"র ভাষা ইহা অপেক্ষা কতকটা উন্নত শ্রেণীর বলিয়া মনে হয়। ইহাতে জীবের জন্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের একখানি হস্তলিখিত পুঁথি হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি: "শ্রীগুরু জিজ্ঞাসেন তোমার শ্রীগুরু তোমাকে কি দেখাইয়া তুমার শ্রীগুরু হৈয়াছেন। শিষ্য কহেন আমার শ্রীগুরু আমারে দেহের মধ্যে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের সহিত নিত্য চৈতন্যরূপ আত্মা, ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখাইয়া আমাকে চৈতন্য করিয়া আমার শ্রীগুরু হইয়াছেন।" [৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে বাংলা গদ্য সাহিত্য পর্যায়ে স্থান পাইবার যোগ্যতা কিছু কিছু অর্জন করিয়াছে দুইখানি গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে একখানি "ভাষাপরিচ্ছেদ"—প্রাপ্ত পুঁথির তারিখ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার ভাষা এইরূপ:

"গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয়। তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম

উত্তর করিতেছেন। তাবৎ পদার্থ জানিলে মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্ত প্রকার।" [৪]

এই গ্রন্থের ভাষা খুব উন্নত না হইলেও ইহা যে গদ্য রচনায় একটি সরল নূতন রীতি প্রবর্তন করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় গ্রন্থ "বৃন্দাবনলীলা"র সঠিক তারিখ জানা নাই—কিন্তু ইহাতে যে গদ্য রচনা রীতির আরও একটু উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি হইতে তাহা বোঝা যাইবে।

"তাহার উত্তরে এক পোয়া পথ চারণ পাহাড়ি পর্বতের উত্তরে কৃষ্ণচন্দ্রের চরণচিহ্ন ধেনুবৎসের এবং উটের এবং ছেলির এবং মহিশের এবং আর আর অনেকের পদচিহ্ন আছেন, যে দিবস ধেনু লইয়া সেই পর্বতে গিয়াছিলেন সে দিবস মুরলির গানে যমুনা উজান বহিয়াছিলেন এবং পাষাণ গলিয়াছিলেন সেই দিবস এই সকল পদ-চিহ্ন হইয়াছিলেন।" [৫]

এই রচনার বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 'পদচিহ্ন' ও 'যমুনা নদীর' পরে সম্মানসূচক 'আছেন' ও 'বহিয়াছিলেন প্রভৃতি ক্রিয়া-পদের প্রয়োগ। ইহা সম্ভবতঃ ভাষাগত বৈশিষ্ট্য নহে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংস্পৃষ্ট চেতন অচেতন সকল পদার্থের প্রতিই ভক্ত বৈষ্ণবের শ্রদ্ধার চিহ্ন মাত্র।

উল্লিখিত দুইটি রচনারই আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহাতে প্রয়োজন মত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার আছে। কিন্তু এই যুগের চিঠি-পত্র ও দলিল প্রভৃতিতে যেরূপ আরবী ও ফার্সী শব্দের প্রাধান্য দেখা যায় তাহার কোন লক্ষণ নাই। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতদের লেখা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের আরও বিশদ পরিচয় পাওয়া

যায় কোচবিহারের রাজমুন্‌সী জয়নাথ ঘোষ সঙ্কলিত "রাজোপাখ্যান" নামক গ্রন্থ হইতে। ইহার ভূমিকা এইরূপ :

"শ্রীশ্রী সদাশিব-বংশ-সম্ভব বিহারস্থ দেশাধিপতি শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ মহাশয় সদাশয় দান মান গুণ ধ্যান ধারণ কুল শীল বল বীর্য্য শৌর্য্য গাম্ভীর্য্য বর্ম্ম ধর্ম্ম কর্ম্ম অস্ত্রশস্ত্র নীতি চরিত্র নিতান্ত শান্ত দান্ত বিদ্যা বিনয় বিচার রাজ-লক্ষণ রাজ-ব্যবহার শরণাগতজন-প্রতিপালনাদি বিষয়ে এবং রূপ লাবণ্যাদিতে যিনি তুলনারহিত রিপুকুল-বন-পঙ্কে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ন্যায় তাহার পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ।"[৬]

এই সংস্কৃত-বহুল অংশের পর রাজার গুণবর্ণনা অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় লিখিত—

"শ্রীশ্রী মহারাজা ভূপ বাহাদুরের বাল্যকাল অতীত হইয়া কিশোর কাল হইবাই পার্শী বাঙ্গলাতে স্বচ্ছন্দ আর খোশখত অক্ষর হইল সকলেই দেখিয়া ব্যাখ্যা করেন বরং পার্শীতে এমত খোষনবিস লিখক সন্নিকট নাহি চিত্রেতে অদ্বিতীয় লোক সকলের এবং পশু পক্ষী বৃক্ষলতা পুষ্প তৎস্বরূপ চিত্র করিতেন অশ্বারোহণে ও গজ চালানে অদ্বিতীয় তীরন্দাজ ও গোলন্দাজিতে উপমা-রহিত অন্য অন্য শিল্পকর্ম্ম যাহা দৃষ্টি হয় তাহা তৎকালীন শিক্ষা করেন।"

কিন্তু এই পণ্ডিতী রচনার সঙ্গে সঙ্গে কথ্য ভাষার ভিত্তিতে আর একশ্রেণীর বাংলা গদ্য সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল। ইউরোপীয় খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের দ্বারাই ইহার সূত্রপাত হয়। সর্ব দেশে সর্বকালেই নূতন কোন ধর্মের প্রচারকেরা প্রথমতঃ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেই প্রচারকার্য আরম্ভ করেন—কারণ তাহাদের মধ্যেই পুরাতন ধর্ম ত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম গ্রহণের সম্ভাবনা বেশী। প্রাচীনকালে গৌতম বুদ্ধের নির্দেশ ছিল যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লৌকিক ভাষার মাধ্যমেই তাঁহার ধর্ম-উপদেশ প্রচার

করিতে হইবে। জৈনগণও এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে চৈতন্যের শিষ্যগণ সংস্কৃতের পরিবর্তে বাংলা ভাষায়ই তাঁহার জীবনচরিত ও ধর্মকথা লিখিয়াছিলেন। ইহার ফলে বাংলা পদ্যের অপরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ঠিক অনুরূপ কারণেই খ্রীষ্টান মিশনারীরা এদেশের সাধারণ লোকের ভাষায় ধর্মপ্রচার করেন। তাঁহারা বিদেশী সুতরাং বাংলা ভাষা শিক্ষা করিবার প্রয়োজনে ইহার ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি সঙ্কলন করেন। চৈতন্য ও তাহার পরবর্তী যুগে বাংলা সাহিত্যের একমাত্র আদর্শ ছিল পদ্য—সুতরাং বাঙ্গালী গ্রন্থকারেরা তাহাই গ্রহণ করিলেন। বিদেশী খ্রীষ্টান মিশনারীদের সম্মুখে এই আদর্শ ছিল না এবং ইহার অনুকরণ করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং তাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য গদ্যেই বক্তৃতা ও আলাপ আলোচনা করিতেন ও সেই ভাষায়ই গ্রন্থাদি রচনা করিতেন। ইহার ফলেই এক নূতন ধরনের বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হইল।

পঞ্চদশ শতাব্দের শেষভাগে, শ্রীচৈতন্যের জীবিতকালেই পর্তুগীজেরা ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়। তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুইটি—ব্যবসা-বাণিজ্য ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচার। ষোড়শ শতাব্দেই পর্তুগীজ মিশনারীরা বঙ্গদেশে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন ও এই উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষার চর্চা করিয়া ঐ ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে পূর্ববঙ্গের (বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের) অন্তর্গত শ্রীপুর হইতে ফ্রান্সিস্‌কো ফার্ণান্দেজ লিখিত একখানি পত্র হইতে জানা যায় যে তাঁহার রচিত দুইখানি খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও কথোপকথন-মূলক একখানি পুস্তিকা অপর একজন মিশনারী বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর আরও গ্রন্থ সম্ভবতঃ ইহার পূর্বে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার একখানিও এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। যে সমুদয় গ্রন্থ পাওয়া

গিয়াছে তাহাদের মধ্যে দুইখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—প্রথম, “ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ”, দ্বিতীয়, “কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ”। একমাত্র রাজোপাখ্যান ব্যতীত পূর্বে যে সমস্ত গদ্য গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে—ইহাদের তুলনায় সাহিত্যের দিক হইতে বিষয়বস্তু, রচনাকৌশল ও ভাবের পরিসর হিসাবে সেগুলি অতি নগণ্য। সুতরাং বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ইহাদের স্থান খুব উচ্চে এবং ইহাদের সম্বন্ধে বিশদ ও বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়োজন।

ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদের একখানি পুঁথি পরলোকগত ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন আবিষ্কার করেন এবং তাঁহার সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ-রচয়িতার পিতা পূর্ববঙ্গের (বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের) অন্তর্গত ভূষণা নামক ক্ষুদ্র জনপদের রাজা অর্থাৎ শাসনকর্তা ছিলেন। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানের মগ জলদস্যুরা তাহাকে অপহরণ করে এবং উপযুক্ত মূল্য পাইয়া পর্তুগীজ মিশনারী ম্যানুয়েল দো রোজারিও-র নিকট বিক্রয় করে। ভূষণার রাজপুত্র নিজে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া অন্যান্য অনেক হিন্দুকেও ঐ ধর্মে দীক্ষিত করেন। খ্রীষ্টধর্ম যে হিন্দুধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি একখানি বাংলা গ্রন্থ রচনা করেন। একজন ব্রাহ্মণের সহিত একজন রোমান ক্যাথলিকের আলাপ আলোচনা ও বাদানুবাদের মাধ্যমে তিনি খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে যে সমুদয় যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের খুবই উপযোগী ছিল—সুতরাং এই গ্রন্থখানি তাহাদের বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ঐ কারণেই ইহার বহুল প্রচারের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রোমান অর্থাৎ ইংরেজী অক্ষরে লিসবন শহরে মুদ্রিত হয় এবং ম্যানোয়েল দা অসুম্পশাও নামক একজন মিশনারি

পর্তুগীজ ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। ইংরেজী হরপে ছাপা হওয়ায় বাংলা শব্দগুলির বানান ও উচ্চারণ সকল সময়ে ঠিক বোঝা যায় না—সুতরাং এই গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কয়েকটি শব্দের কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে।

"রোমান ক্যাথলিক—কৃষ্ণ পরম ব্রহ্ম অবতীর্ণ কহ। ভাল এখনে বিচারে পাইব। তাহান চরিত্র কার্য্য বুঝিব। তিনি কি কারণ জন্মিয়াছিলেন—কোথায় তাহা কহ।

ব্রাহ্মণ—গোকুলে জন্মিয়াছিলেন, বসুদেবের পুত্র, দৈবকীর উদরে কংস বধ করিতে এবং অগাসুর বকাসুর আর রাধা আর ষোলশ গোপিনী লইয়া ক্রীড়া করিলেন ছাপার্ণ কোটি যদুবংশ আপনের তাহা বধিলেন—তাহার উদরে ব্রহ্মাণ্ড দেখিল যশোদা আর কালিয় দমন করিলেন, তাহার বিষে ঝাপ দিলেন বর্ণ কাল হইল, তাহাতে নাম কৃষ্ণ।...উনি পুর্ণ ব্রহ্ম যেখানে থাকিয়া আসিয়াছিলেন সেই তেজে মিশিল গিয়া তাহার শরীর।"

পুর্বোক্ত দ্বিতীয়গ্রন্থখানি প্রথমখানির পর্তুগীজ অনুবাদক উল্লিখিত ম্যানোয়েল দা অস্সুম্পশাও ১৭৩৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়াল শহরে রচনা করেন। ইহার নাম সাধারণতঃ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বলিয়া লিখিত হয়। কিন্তু মূল পুঁথিতে অর্থ ও ভেদ এই দুইটি শব্দের মধ্যে 'কমা' চিহ্ন আছে। এইজন্য কেহ কেহ ইহাকে 'অর্থ বেদ' এইরূপ পড়িয়াছেন। এই গ্রন্থে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের আচার অনুষ্ঠান, ধর্মমত প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার জন্য কয়েকটি ধর্মমূলক উপাখ্যান যোগ করা হইয়াছে। এইরূপ একটি কাহিনী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"গালিসিয়া দেশে এক ভক্তী মাইয়া জন্মিল লুসিয়া নামে। তাহারে জোয়ান কালে সিদ্ধা দেমিনগোস মালার ভজনা শিক্ষা দিলেন। সেও শিক্ষা ধরিল। প্রতিদিন ভক্তিরূপে মালা জপিল।

পরে বার বছর তার উমর হইল। বড় মুনিষ্যের লগে বিবাহ হইল। বিবাহ হইয়া তাহার ভাতারে তাহারে লইয়া গেল আন্দালুসিয়াতে। সেখানে বসত করিল। এহি কালে মোছলমানের লস্কর আসিয়া বড় যুদ্ধ করিল। মারামারি বহুত হইল। যুদ্ধেতে লুসিয়ার ভাতার মরিল। শত্রে লুসিয়ারে ধরিয়া নিল। গ্রাণাদাতে বেশ্যা হইল; লুসিয়া বাঁদী হইল।"[৮]

এই সমুদয় গ্রন্থ ব্যতীত বাংলায় লেখা চিঠি-পত্র দলিল প্রভৃতি হইতেও গদ্য সাহিত্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে সর্বপ্রাচীন কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ কর্তৃক আহোমরাজ চুকামফা স্বর্গদেবের নিকটে লিখিত একখানি পত্র। ইহার তারিখ ১৪৭৭ শক অর্থাৎ ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার ভাষার নমুনা দিতেছি।

"লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রপত্রিগতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বর্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমারো এ গোট কর্ত্তব্য উচিত হয়, না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিমা।"[৯]

কোচবিহারের এই ভাষা বাংলাদেশের সাধারণ ভাষা ছিল কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু অন্য কোন নমুনার অভাবে ইহা বঙ্গদেশে ষোড়শ শতাব্দে প্রচলিত ভাষার সদৃশ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার সহিত পুর্বোদ্ধৃত রূপ গোস্বামীর কারিকার ভাষা তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে ইহার মধ্যে কথ্যভাষার প্রভাব বেশী—চিঠিপত্রের ভাষায় এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ইহার মধ্যে পরবর্তী কালের ন্যায় ফারসী শব্দের ব্যবহার নাই।

পরবর্তী একশত বৎসরে এই ভাষার কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছিল

১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত নিম্নলিখিত পত্রখানি হইতে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

"সতকোটি দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদনঞ্চ অগে মহাসএর চরণক্র(ক্ব)-পাতে এজনার প্রাণগতিক মঙ্গল হয় পরে সাক্ষৎকে নিবেদন কএক দিবস হইল তথাকার মঙ্গলাদি পাই নাই মঙ্গলাদি লেখিয়া আপ্যাইত করিবেন আমিহ আশুড়্যা তালুকে বক্সী মহলে মকরোর হইয়াছি এ তাবৎ নিকট আশীতে পারিলাম না অবগাসক্রমে সাক্ষত পোহছিব মহাশয় আমার কর্ত্তা আমি ছাওল আমার দোস সকল আপনকার মাপ করিতে হয়।"[১০]

কিন্তু ঠিক এই সময়েই আইন আদালতের প্রভাবে বাংলা ভাষায় ফারসী শব্দের কিরূপ আমদানী হইয়াছিল ১০৯৭ সালের (১৬৯১ খ্রীঃ) শ্রীরামকান্ত ঠাকুরকে লিখিত নিম্নলিখিত আরজী হইতে বোঝা যাইবে।

"আরজ নিবেদন আমার এই সাকিমের শ্রীমাণিক রায় স্থানে আমার মূল দশ তঙ্কা পানা ছিল তাহাতে আমি আসামী মজুকুরে স্থানে টাকা চাইতে গেয়াছিলাম তাহাতে আমাক টাকা দিলাক না আমাকে তুই চারি বদ জবান গালি দিলাক এবং আমাকে মারিতে উদ্যত হইল এ কারণ নালিশ আসামী মজুকুরকে হুজুর তলপ করিয়া হক ইনসাব করিতে আজ্ঞা হএ আমি গরিব প্রজা সাহেব ধর্ম্ম অবতার আমা বারে যেমত হুকুম হএ এতদর্থে আরজ নিবেদন লিখিয়া দিলাম।"[১১]

ইহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে (১৬৫৩ খ্রীঃ) লিখিত একখানি দলিলে ৩০টি শব্দের মধ্যে মাত্র দশটি বাংলা বাকী সকল ফার্সী।[১২] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত বাংলায় লেখা দলিলপত্র এই-রূপ দুর্বোধ্য ছিল। তবে মাঝে মাঝে শুদ্ধ বাংলা ভাষায় আরজি লিখিত হইত।[১৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের ভাষা কিরূপ ছিল পূর্বে কয়েকখানি গ্রন্থের সাহায্যে তাহার কিছু পরিচয় দিয়াছি। চিঠিপত্রে ইহার অনেকগুলি নমুনা পাওয়া যায়। কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি।

১১১৫, ১১৩৭ ও ১১৩৮ বাংলা সনে অর্থাৎ ১৭১৯ হইতে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত তিনখানি ইস্তফা পত্র পাওয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্মে প্রচারিত স্বকীয়া-প্রেম অথবা পরকীয়া-প্রেম শ্রেষ্ঠ ও শাস্ত্র-সঙ্গত ইহা লইয়া গুরুতর মতভেদ ছিল। জয়পুরের মহারাজা স্বকীয়া-প্রেমই যে শ্রেষ্ঠ ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য একজন বৈষ্ণব পণ্ডিত পাঠাইলেন। তিনি ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ বাংলাদেশের বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের সহিত ছয় মাস ধরিয়া তর্ক বিতর্ক করিলেন। তাঁহাদের নিকট পরাভূত হইয়া জয়পত্র লিখিয়া দিলেন এবং পরকীয়া-প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন। পূর্বোক্ত তিনখানি ইস্তফা পত্রে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথম ভাগের বাংলা গদ্যের নমুনা স্বরূপ ইহার একখানি হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"জয়পত্রমিদং আমিহ সকিয় ধর্ম সংস্থাপন করিতে জয়নগর হইতে শ্রীযুৎ সেওায় জয়সিংহ মহারাজার সেখান হইতে সকিয় ধর্ম্মের পরওানা লইয়া গৌড়মণ্ডলে সকিয় সংস্থাপন করিতে আসিয়াছিলাম এবং শ্রীযুৎ পতিসাহার হুকুম ও তেনাতি লোক সঙ্গে করিয়া গৌড় মণ্ডলে সর্ব্বশুদ্ধা সকিয় সিদ্ধান্তের জয়পত্র লইয়া আসিয়াছিলাম মালি-আটি মোকামে তোমা নিকট সকিয় পরকীয় ধর্ম্মবিচার অনেক মতে করিলাম এবং শ্রীমত ভাগবত এবং পুরাণ এবং শ্রীশ্রী৺গোস্বামীদির্গের ভক্তিশাস্ত্র লইয়া সিদ্ধান্তমতে সকিয় ধর্ম্মের স্থাপন করিতে পারিলাম নাই অতএব পরকীয় ধর্ম্ম বেদ বেদান্ত ও ভক্তিশাস্ত্র সংস্থাপন হইল ইহাতে পরাভূত হইয়া জয়পত্র লিখিয়া দিলাম এবং সিষ্য হইলাম।"[১৪]

এই জয়পত্রখানি একজন প্রবীণ সংস্কৃত পণ্ডিতের লেখা অথচ ইহাতে সংস্কৃত শব্দের বানানেও ভুল আছে এবং পদবন্ধনে অনেক

শিথিলতা দেখা যায়। ইহার সহিত তুলনা করিলে ১১৭৮ সনে (১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে) পুত্রের নিকট লিখিত মহারাজা নন্দকুমারের একখানি পত্রের ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল। ইহার আরম্ভ এইরূপ ঃ

"তোমার মঙ্গল সর্বদা বাসনা করণক অত্র কুশল পরন্তু ২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুক্ত ফেতরৎ আলি খাঁ-এর এখানে আইসনের সম্বাদ যে লিখিয়াছিলে এতক্ষণতক পঁহুছেন নাই পঁহুছিলেই জানা যাইবেক। শ্রীযুত রায় জগচ্চন্দ্র বিষ রোজের পর বাটি হইতে আসিয়াছেন যেমত ২ কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল। তিনি যথা ১ জাউন ফলত কার্য্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন স্পষ্ট হইয়া আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক।"[১৫]

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগে সরল কথ্য ভাষায় লিখিত কয়েকখানি পত্রের কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

ইংরেজ দপ্তরে রক্ষিত বাংলায় লিখিত ১৬৭খানি চিঠি ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন সঙ্কলন করিয়াছেন এবং এই সঙ্কলন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেক স্থানের ভাষা দুর্বোধ ও ফারসী শব্দের বাহুল্য আছে—কিন্তু সরল গদ্যেরও নমুনা আছে। কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি।

১। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লিখিত লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট কোচবিহার সরকারের পত্র।

"ধজেন্দ্র নারায়ণ রাজা আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে খানখা কাটিয়াছিল এ কারণ ভুটিয়ার স্থানে কএদ রহিল আমার ছাওাল শ্রীমান নাজির দেও খগেন্দ্র নারায়ণ রাজেন্দ্র নারায়ণকে রাজা করিল। তাহার পর রাজেন্দ্র নারায়ণ রাজার পরলোক হইলে পর কএদি রাজার পুত্র রাজার উপযুক্ত নহে তুমি রাজা হও অথবা অন্য কাহাকো রাজা

করহ তাহা আমার ছাওাল মনজুর করিল না একারণ সন ১১৭৯ সালে ভুটিয়ার সহিত কাজিয়া (হইল) (পৃষ্ঠা ৬)

২। শ্রীহরিমোহন বাবু কর্তৃক ওলন্দাজ কোম্পানির ডিরেক্টারের নিকট ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট তারিখে লিখিত পত্র।

"মে ওয়াল সাহেব জবরদস্তী করিয়া তাতি লোককে কাপড় বুনিতে দেয় না মুচলকা লইয়াছেক সেওয়ায় ইঙ্গরেজের কোম্পানি আর কোন মহাজনের কাপড় বুনিতে পারিবে না ইহাত তাতীলোক আমাদিগের কাপড় বুনিতে রাজ জদি ছাপীয়া আমাদের কাপড় কেহ বোনে তাহা ছেনাইয়া লন এবং মারপিট করেন ইহাত আমাদিগের কর্ম্মবন্ধ হইয়াছে—জাহাতে কাজ চলে এমন তদারক করিতে হুকুম হয়।" (পৃষ্ঠা ৩)

৩। বহুলোকের স্বাক্ষরিত বীরভূম জিলার জজ সাহেবের নিকট দেওঘর বৈদ্যনাথ মন্দিরের ওঝা নিযুক্তির জন্য ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের এক আর্জিপত্র : "আগে শ্রীশ্রী৺ঠাকুরের ওঝাগিরি কার্য্যের রামদত্ত ঝা ছিলেন তাহার ৺প্রাপ্তি হইলে হযুরের হুকুম মত ঝামত ওঝার (?) পুত্র শ্রীযুত আনন্দ দত্ত ওঝা সকুল কার্য্যে খবর গিরি ষুন্দর মত করিতেছেন কিন্তু ওঝা গিরি কার্য্যে নিযুক্ত না হওআতে শ্রীশ্রী৺ঠাকুরের সেবার অনেক কার্য্য আটক হইতেছেক তাহাতে যাত্রিক লোকের মনের খেদ হয়ে সংপ্রতিক ফালগুন মাসের সিবরাত্রির ব্রত নিকট হইতেছে নানাদেসের লোক দরসনে আসিবেক ইহার মৈদ্ধে ওঝাগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হইলে বড় ভালো হয়ে।" (পৃঃ ৭৬)

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত এবং বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 'চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র' নামক গ্রন্থে বহু চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে তিনখানি চিঠির কিয়ৎ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

১। বাংলা ১১৯৬ সনে (১৭৮৯ খ্রীঃ) লিখিত।

"আমার দ্বিতিয় কন্যার ষুভ বিবাহ ২৯ ওনত্রিষ্যা অগ্রহায়ন রবিবার হইবেক অতয়েব অনুগ্রহপূর্ব্বক মহাশয় এবাটীকে আশীয়া ষুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে আজ্ঞা হইবেক শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম।"[১৬]

২। বাংলা ১২০১ সালে (১৭৯৪ খ্রীঃ) লিখিত।

"১০ পৌষ রবিবার দিবষ আমার পীতা ঠাকুরের শ্র্যার্দ্ধ আমার পুরহিত শ্রীযুত মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে আশীতে পত্র লিখিতেছী তিহো বাড়িতে থাকেন তাহাকে অদ্যই আশীতে কহিবেন বাড়িতে না থাকেন তাঁহার তরফ জনেক ব্রহ্মণকে পাঠাইবেন এখানের ক্রীয়া করাইয়া জায় ইহা নিবেদন করিলাম ইতি।"[১৭]

৩। ১১৯৮ সনে (১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত ব্যবসায়ীর পত্র।

"শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ঘোষজা খুড়া এখান হইতে দিবস আষ্টেক হইল মোকামে গিয়াছেন সকল কথা তাঁহার সাক্ষ্যাতে কহিয়াছি তাহাতেই জ্ঞাত হইয়া থাকিবা। অদ্যাপি কাপড় পাঠাইলা না এখানে ইঙ্গেরের সহিত কাপড় সওদা করিয়াছি অতয়েব রাতি বিরতে জে ষুরতে কাপড় আসিয়া পহুঁছে তাহা করিবা জল এইক্ষ্যনে হইল না মোকাম কাটঙায় নৌকাজোগে জে প্রকারে রাহি হয় তাহা করিবা কদাচ গৌন করিবা না গৌন হইলে সওদা চটিবেক আর আমাকে খেসারত দিতে হবেক ইহা বুঝিয়াঁ কার্য করিবা আর কাপড় জত তৈয়ার থাকে তাহাই এ চালানে পাঠাইবা এখন জে কাপড় আসিবেক তাহাই বিক্রী হবেক ইহার পর গৌনে জে কাপড় আসিবেক তাহা বিক্রী হওয়া ভার হবেক।[১৮]

উপরে নানাশ্রেণীর লোকের রচিত বাংলা গদ্যের যে সমুদয় নমুনা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাংলা গদ্য ভাষা সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী হইয়া উঠে নাই তবে ইহার সম্ভাবনা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু ইহার পরে মাত্র দশ পনর বৎসরের মধ্যেই যে এই সাহিত্যের আবির্ভাব

হইবে এরূপ মনে করিবার পক্ষে কোন সঙ্গত যুক্তি ছিল না। কিন্তু একটি বিশিষ্ট ঘটনা ও কয়েকজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির যোগাযোগই বাংলা গদ্যের এই আকস্মিক উন্নতির কারণ। ঘটনাটি হইল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা যাহাতে এ দেশের ভাষা ও সাহিত্য এবং প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক সামাজিক প্রভৃতি তথ্য-সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

এই কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষরূপে যাঁহাকে নিযুক্ত করা হয় তিনি একজন অসাধারণ মনীষী ছিলেন। তাঁহার নাম উইলিয়ম কেরী। তাঁহার জীবন-কাহিনী অতিশয় বিচিত্র। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়। প্রথম জীবনে তিনি জুতা সেলাইয়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। কিন্তু এই অবস্থায়ও তিনি সর্বপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করিতেন। গণিত ও উদ্ভিদ বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লাতিন গ্রীক হিব্রু প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। খ্রীষ্টান মিশনারীরূপে তিনি ১৭৯৪ খ্রীঃ বাংলাদেশে আসেন। প্রথমে সুন্দরবনে কৃষিকার্য, তারপর পাঁচ বৎসর মালদহে নীলকুঠির অধ্যক্ষতা করিয়া ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামপুরে একটি খ্রীষ্টীয় মিশন গঠন করেন। প্রচার কার্যের সুবিধার জন্য তিনি বাইবেলের বঙ্গানুবাদ করেন এবং ইহা ২৬টি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। ১৮০১ খ্রীঃ তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত বাংলা ও মারাঠি ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ভারতে যত বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে তিনি বাংলা ভাষাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষরূপে তিনি যে কয়েক-জন সহযোগী নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং সহকারী পণ্ডিত রামরাম বসু ও রাজীব

লোচন মুখোপাধ্যায়ের নাম বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ কেরী ও এই কয়েকজনের রচনার ফলেই বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

কেরী ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেলের অনুবাদ, একখানি বাংলা ব্যাকরণ ও 'কথোপকথন' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮১২ খ্রীঃ 'ইতিহাসমালা' এবং ১৮১৫ খ্রীঃ 'বাংলা-ইংরেজী অভিধান' নামক বৃহৎ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

কেরীর 'কথোপকথন' গ্রন্থের এক মাস পূর্বে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাঙ্গালী রচিত প্রথম গদ্য পুস্তক রামরাম বসু প্রণীত "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" প্রকাশিত হয়। পরবর্তী বৎসরে 'লিপিমালা' নামে তাঁহার আর একখানি পুস্তক মুদ্রিত হয়।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' ১৮০২ এবং 'হিতোপদেশ' ও 'রাজাবলি' ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ১৮০৪ খ্রীঃ 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' নামক পুস্তক রচনা করেন এবং পর বৎসর ইহা প্রকাশিত হয়।

১৮০১ হইতে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও তাঁহার তিনজন সহযোগী উল্লিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করিয়া বাংলা গদ্য ভাষাকে সাহিত্যের উপযোগী করিয়া তোলেন এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এই নূতন ভাষা ও সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করার জন্য ইঁহাদের প্রত্যেকের রচনা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

১। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (পৃঃ ৪৮)[১]

"এক দিবস রাজার বাহির গড়ের সেনাপতি কমল খোজা নামে একজন মহা পরাক্রান্ত এবং রাজার কাছে বড়ই প্রতিপন্ন হাত যোড় করিয়া নিবেদন করিল রাজার গোচরে। মহারাজা আমি দুই তিন

দিবস হইতে দেখিতেছি রাত্রি তুই প্রহরের পরে ঐ জঙ্গলটাতে অকস্মাত অগ্নি আকার প্রজ্বলিত হয় বড়ই দীপ্তিকর প্রচণ্ড অনলের ন্যায় তাহাতে প্রথম দিবস ঠাওরাইলাম বুঝি কোন রাখাল ইত্যাদি লোক এ বনে অগ্নি দিয়া থাকিবেক তাহাতে 'রাত্রে প্রজ্বলিত হই-য়াছে। প্রাতে ঘোড় শোয়ারিতে যাইয়া দেখিলাম বন পুর্ব্বের মতই আছে বরং অধিক তেজস্ব। তুই তিন দিবস হইতে আমি এই মত দেখিতেছি। মহারাজা আমাকে ভ্রান্ত জ্ঞান করিবেন এ পরাভয় প্রযুক্ত নিবেদন করি নাই।"

২। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

(ক) বত্রিশ সিংহাসন (পৃঃ ৪)[১৯]

"অবন্তী নাম নগরেতে ভর্তৃহরি নামে এক রাজা ছিলেন তাঁহার অভিষেককালে শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন অপমান পাইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলেন। শ্রীভর্তৃহরি অভিষিক্ত হইয়া পুত্রতুল্য প্রজাপালন তুষ্টের দমন এইরূপে পৃথিবী পালন করেন।···সেই নগরে এক ব্রাহ্মণ ভুবনেশ্বরী দেবীর আরাধনা করেন আরাধনাতে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী প্রত্যক্ষ হইলেন ও কহিলেন। হে ব্রাহ্মণ বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ অনেক স্তব বিনয় করিয়া কহিল হে দেবি আমার প্রতি যদি প্রসন্না হইয়াছেন তবে আমাকে অজরামর করুন।"

(খ) রাজাবলি (পৃঃ ১৪১)[১৯]

"কান্যকুব্জ দেশের রাজা জয়চন্দ্র রাঠোর মহাবল পরাক্রম ছিলেন এবং বড় ধনী ছিলেন কাহাকে বলেতে কাহাকে প্রীতিতে এইরূপে প্রায় কুমারিকাখণ্ডস্থ সকল রাজাকে আপন বশীভূত করিয়াছিলেন তাঁহার অনঙ্গমঞ্জরী নামে অপূর্ব্ব সুন্দরী এক কন্যা ছিলেন তাঁহার বিবাহের নিমিত্তে যে যে বর উপস্থিত হয় তাহারদের মধ্যে কেহ তাঁহার মনোনীত হইল না। পরে রাজা এক দিবস উদ্বিগ্ন হইয়া কন্যাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন···রাজকন্যা কহিলেন আমি এই মনে করিয়াছি আপনি. এক রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করুন তাহাতে সকল রাজারদের নিমন্ত্রণ করুন তবে সকল রাজারা অবশ্য আসিবেন সেই রাজারদের মধ্যে আপন মনোনীত যে রাজাকে দেখিব তাহাকে স্বয়ং বরণ করিব।”

৩। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (পৃঃ ৩৪)[২০]

“এক দিবস জগৎসেটের বাটীতে রাজা মহেন্দ্র প্রভৃতি সকলে বসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আহ্বান করিলেন দূত আসিয়া রাজাকে লইয়া গেল যথাযোগ্য স্থানে সকলে বসিলেন। ক্ষণেক পরে রাজা রামনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন আপনারা সকলেই বিবেচনা করুন দেশাধিকারী অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত উত্তর ২ দৌরাত্ম্যের বৃদ্ধি হইতেছে অতএব কি করা যায়।······

“পশ্চাৎ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিবেদন করিলেন এ দেশের উপর বুঝি ঈশ্বরের নিগ্রহ হইয়াছে নতুবা এককালীন এত হয় না প্রথম যিনি দেশাধিকারী ইঁহার সর্ব্বদা পরানিষ্ট চিন্তা এবং যেখানে শুনেন সুন্দরী স্ত্রী আছে তাহা বলক্রমে গ্রহণ করেন এবং কিঞ্চিৎ অপরাধে জাতি প্রাণ নষ্ট করেন দ্বিতীয় বরগী আসিয়া দেশ লুট করে তাহাতে মনোযোগ নাই তৃতীয় সন্ন্যাসী আসিয়া যাহার উত্তম ঘর দেখে তাহাই ভাঙ্গিয়া কাষ্ঠ করে তাহা কেহ নিবারণ করে না।”

উপরে উদ্ধৃত চারিটি রচনা পাঠ করিলে ইহা যে বাংলা গদ্য সাহিত্যের অগ্রদূত সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। বস্তুতঃ খুব সামান্য দু' একটি পরিবর্তন ও ছেদচিহ্ন যোগ করিয়া ইহাকে বর্তমান যুগের গদ্য রচনা বলিয়া চালান অসম্ভব নহে।*

৪। উইলিয়াম কেরী

কেরী সাহেবের রচনায় দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালী লক্ষিত হয়।

তাঁহার প্রথম রচনা 'কথোপকথন' কথ্য ভাষায় লিখিত। গ্রাম্য অশিক্ষিত স্ত্রী মজুরের কথাবার্তার নমুনা দিতেছি।

"ফলনা কায়েতের বাড়ী মুই কায করিতে গিয়াছিনুঁ তার বাড়ী অনেক কায আছে। তুই যাবি।

না ভাই মুই সে বাড়ীতে কায করিতে যাব না তারা বড় ঠেঁটা। মুই আর বছর তার বাড়ী কায করিয়াছিলাম মোর তুদিনের কড়ি হারামজাদগি করিয়া দিল না মুই সে বেটার বাড়ী আর যাব না।[২১]

ইহার এগার বৎসর পরে লিখিত 'ইতিহাসমালা'র রচনা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং অধিকতর উন্নত। দৃষ্টান্ত: "সাধু স্বভাব এক ব্যক্তি পথে যাইতেছিলেন তথাতে এক সরোবরে কথগুলি লোক বড়িশীতে মাংসাদি অর্পণ করিয়া মৎস্য ধরিতেছে মৎস্য সকল আহারার্থ আসিয়া আপন ২ প্রাণ দিতেছে ঐ সাধু এইরূপ দেখিয়া নিকটস্থিত এক রাজসভাতে গিয়া কহিলেন অদ্য পুষ্করিণীর তটে আশ্চর্য দেখিলাম সভাস্থিত ব্যক্তিরা কহিল কি তিনি কহিলেন দাতা ব্যক্তি নরকে যাইতেছে এবং গ্রহীতাও প্রাণত্যাগ করিতেছে..."[২২]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ কর্তৃক বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়ার কয়েক বৎসর পরেই মনস্বী রামমোহন রায় বাংলা গদ্য সাহিত্যে গুরুগম্ভীর বিষয় আলোচনা দ্বারা ইহার মর্যাদা ও পরিসর বৃদ্ধি করেন। তাঁহার প্রথম তুই পুস্তক 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' ১৮১৫ খ্রীঃ 'তলবকার উপনিষৎ' ও 'ঈশোপনিষৎ' ১৮১৬ খ্রীঃ এবং 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' ও 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' ১৮১৬-১৭ খ্রীঃ রচিত হয়। ইহার পর ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে আরও বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁহার ভাষার তুইটি নমুনা দিতেছি।

(১) "এস্থানে এক আশ্চর্য এই যে অতি অল্প দিনের নিমিত্ত আর অতিঅল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা

ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন আর পরমার্থবিষয় যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারি আর অতি মূল্য হয় তাহার গ্রহণ করিবার সময় কি শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না আপনার বংশের পরম্পরা মতে আর কেহ ২ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয় সেইরূপ গ্রহণ করেন এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব।"[২৩]

(২) দেখ কি পর্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্ত করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন…[২৪]

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহনের স্থান যে অতি উচ্চে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের স্রষ্টা; বহুকাল অবধি এই মত প্রচলিত থাকিলেও ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। কারণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ তাঁহার প্রথম রচনা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই যে সমুদয় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহার সাবলীল ও সহজ রচনারীতি সাহিত্যের বাহন হিসাবে রামমোহনের রচনারীতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখিয়াছেন "এখনকার দিনে ছেদচিহ্ন বিরল রামমোহনের বাক্যাবলী উদ্ভট ঠেকিতে পারে কিন্তু সে সময়ের কলেজি রচনার সঙ্গে মিশাইয়া দেখিলে:বোঝা যাইবে কেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত প্রাচীনতার ভক্তও বলিয়াছিলেন "দেওয়ানজী জলের মত বাংলা লিখিতেন।"[২৫]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণের রচনার যে নমুনা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সহিত রামমোহনের ভাষার তুলনা করিলে এই উক্তি কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।

সুকুমারবাবু আরও বলিয়াছেন যে "বিচার-বিশ্লেষণে উচ্চতর চিন্তার বাহন হিসাবে প্রথম ব্যবহারে লাগাইয়া (রামমোহন) বাংলা গদ্যকে জাতে তুলিলেন।" কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' নামক দুই গ্রন্থে বিচার বিশ্লেষণে উচ্চতর চিন্তার বাহন হিসাবে বাংলা ভাষারই ব্যবহার করিয়াছেন। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' ১৮১৭ ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। অবশ্য এই দুই গ্রন্থের ভাষা ১৬ বৎসর পূর্বে রচিত গ্রন্থের মত সরল নহে, সংস্কৃত-বহুল। কিন্তু রামমোহনের শাস্ত্র বিচারের ভাষা হইতে খুব নিকৃষ্ট মনে হয় না। দুয়ের ভাষার তুলনা করিলেই তাহা বোঝা যাইবে।

১। রামমোহনের ভাষা :

"কেহ কেহ কহেন ব্রহ্মপ্রাপ্তি যেমন রাজ প্রাপ্তি হয়। সেই রাজ প্রাপ্তি তাঁহার দ্বারীর উপাসনা ব্যতিরেকে হইতে পারে না সেইরূপ রূপগুণ বিশিষ্টের উপাসনা বিনা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবেক না।...ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী আর যাঁহাকে তাহার দ্বারী কহ তেহো মনের অথবা হস্তের কৃত্রিম হয়েন কখন তাঁহার স্থিতি হয় কখন স্থিতি না হয় কখন নিকটস্থ কখন দূরস্থ অতএব কিরূপে এমত বস্তুকে অন্তর্য্যামী সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে নিকটস্থ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন কহা যায়।" (বেদান্ত গ্রন্থ —বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় পৃঃ ১৭৫৪-৫)

২। মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা—"আর যদি মন্দির মসজিদ গীর্জা প্রভৃতি যে কোন স্থানে যে কোন বিহিত ক্রিয়া দ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্য হন তবে কি সুঘটিত স্বর্ণমৃত্তিকা পাষাণ কাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয় কিম্বা দৃষ্টি কৌরূপ্য হয়...কিম্বা সর্ব্বত্রগ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর অন্যত্র প্রতিমাদিতে পূজান্তবাদি যাহা যাহা হয় তাহা দেখিতে পান না ও শুনিতে পান না।" (বেদান্ত চন্দ্রিকা ২০৭ পৃঃ)

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন রামমোহনের দাবির সপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মন্তব্য উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু গুপ্ত কবির সমসাময়িক দেওয়ান রামকমল সেন মহাশয় ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'A Dictionary in English and Bengalee' গ্রন্থে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে বাংলা গদ্য সাহিত্য সৃষ্টির কৃতিত্ব কেবী সাহেব ও তাঁহার সহযোগীদেবই প্রাপ্য।[২৬] বর্তমান যুগে ডাক্তার সুশীলকুমাব দে ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন।[২৭]

'রামমোহন রায় বাংলা গদ্যের জনক', এই মত যখন প্রচলিত হয়, তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব পণ্ডিতদের গ্রন্থগুলি খুব সুপরিচিত ছিল না। এই সমুদয়ের উল্লেখ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন: "বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবৃন্দের দান অপরিসীম। তাঁহারা সকলেই রামমোহনের পূর্বগামী।"[২৮]

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে একথা স্বীকার করা কঠিন যে রামমোহন রায়ই বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক। তিনি বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করেন বা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন, ইত্যাদি দাবি বহুল প্রচার সত্ত্বেও ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনকত্বও অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণা। যে কোন মহৎ ব্যক্তির মুগ্ধ ভক্তগণের স্বভাব এই যে যাহা কিছু ভাল বা নূতন তাহার সকলের কৃতিত্বই ঐ একজনকে দিবার আগ্রহ হয়। বর্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে।

কিন্তু রামমোহন রায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা নহেন ইহাও যে পরিমাণ সত্য, ইহার উন্নতি সাধনে তাঁহার দান যে অপরিসীম তাহাও তেমনি সত্য। তিনি প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থ এবং তর্ক ও বিচারমূলক গ্রন্থ বহুলসংখ্যায় রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যে ভাবের গভীরতা ও ভাষার শব্দসম্পদ অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং বাক্য

বিন্যাস রীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট নৈপুন্য দেখাইয়া বাংলা ভাষাকে সতেজ ও পুষ্ট করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া এই সময় হইতে বাংলা সাময়িক পত্রও গদ্য সাহিত্য পুষ্টির বিশেষ সহায়তা করে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক "দিগ্‌দর্শন" এবং সাপ্তাহিক "বাঙ্গাল গেজেটি" ও "সমাচার দর্পণ" প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে একমাত্র 'সমাচার দর্পণ' দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। ১৮২১ সনে "ব্রাহ্মণ সেবধি" ও "সম্বাদ কৌমুদী" প্রকাশিত হয়। রাজা রামমোহন রায় এই দুইটি পত্রিকার সহিতই বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী'র অন্যতম প্রকাশক হইলেও ইহাতে সহমরণ প্রথার সমর্থন থাকায় ইহার সংশ্রব ত্যাগ করিয়া 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে সনাতন-পন্থী নূতন একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন (১৮১২ খ্রীঃ)। ইহার পর বাংলা ভাষায় লিখিত বহু সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সমুদয় পত্রিকা বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রসারে ও উন্নতিতে যে কতদূর সাহায্য করিয়াছিল এবং ইহাদের প্রচারের ফলে বাংলা গদ্য ভাষা ও সাহিত্য যে কিরূপ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার সবিস্তার পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভবপর নহে।

পূর্বোক্ত বাংলা গদ্য গ্রন্থগুলির পরে আরও কয়েকখানি গ্রন্থ নূতন গদ্য রীতিতে লিখিত হয়। ইহাদের মধ্যে পূর্বোক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনখানি গ্রন্থ—'নববাবু বিলাস' (১৮২৩ খ্রীঃ) 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩ খ্রীঃ) ও 'নববিবিবিলাস' (১৮৩০ খ্রীঃ)[১১] গদ্য সাহিত্যে তাঁহার লিপি-কুশলতার পরিচয় দেয়। যে কথ্য ভাষার প্রবর্তক হিসাবে "আলালের ঘরের দুলাল" প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এই তিনখানি গ্রন্থেই তাহার পূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন যে "রামমোহন রায়ের

চরণ বাংলা ভাষায় লালিত্য ও রস সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন।"[৩০] কিন্তু বিষয়বস্তুর অশ্লীলতা এবং গ্রাম্য ও ইতর রসিকতা প্রাধান্য লাভ করায় এই সমুদয় গ্রন্থ সাহিত্য হিসাবে যথেষ্ট মর্যাদা পায় নাই।

ইহার পর আসিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ১৮৪৭ খ্রীঃ 'কথামালা' ও 'চরিতাবলী' ১৮৫৬ খ্রীঃ, এবং 'সীতার বনবাস' ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কয়খানি এবং তাঁহার রচিত অন্যান্য বহু গ্রন্থ বাংলা গদ্য সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিল। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে: "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলা নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।"[৩১]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক তিনজন সাহিত্যিকের উল্লেখ করিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। শ্রীমতী হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স্ বিরচিত "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" ১৮৫২ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়।[৩২] ইহাই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাস। খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত কয়েকটি বাঙ্গালীর জীবন কাহিনী ইহার বিষয়বস্তু। ইহাতে নিম্নশ্রেণীর লোকের কথোপকথনের ভাষার সহিত বিদেশী মিশনারীদের ব্যবহৃত বাংলা ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' যথাক্রমে ১৮৫৮ ও ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে

প্রকাশিত হয়। এই উভয় গ্রন্থেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত-বহুল ভাষার পরিবর্তে কথ্য ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত ভাষা-রীতিই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা পরিমার্জিত হইয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং এখনও সাহিত্যের ভাষা বলিয়া স্বীকৃত।

পাদটীকা

১। দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৫৬৬।

২। ঐ।

৩। দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গসাহিত্য পরিচয়—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৩০-৩৭।

৪। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৫৬৭।

৫। ঐ।

৬। বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, পৃঃ ১৬৭৮।

৭। পৃষ্ঠা ৪৫।

৮। কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ—সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, পৃঃ ১৯৯।

৯। বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, পৃঃ ১৬৭২।

১০। চিঠিপত্রে সামজ চিত্র—শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪০৮।

১১। বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, পৃঃ ১৬৭৩।

১২। চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র, পৃঃ ৩৪৬।

১৩। ঐ, পৃঃ ১৭২। ১৪। ঐ, পৃঃ ১১৩।

১৫। ভারতবর্ষ,

১৬। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬।

১৭। ঐ, পৃঃ ৮২।

১৮। ঐ, ২০২।

১৯। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত সংস্করণ।

২০। সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত"—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা।

২১। উইলিয়ম কেরী—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, পৃঃ ৩৭।

২২। ঐ, পৃঃ ৪৩।

২৩। রামমোহন রায়—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, পৃঃ ৭৩।

২৪। ঐ, পৃঃ ১৪। এই উক্তির অবশিষ্ট অংশ পঞ্চম বক্তৃতায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

২৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৬।

২৬। উইলিয়ম কেরী, পৃঃ ২৪।

২৭। S K De—Bengali Literature in the Nineteenth Century, p. 156.
উইলিয়ম কেরী, পৃঃ ৫৬।

২৮। রামমোহন রায়, পৃঃ ৭০।

২৯। এই তিনখানি গ্রন্থ রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস হইতে যথাক্রমে ১৩৪৪, ১৩৪৫ ও ১৩৪৪ বাংলা সনে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম তৃতীয় গ্রন্থের রচনাকাল ঠিক জানা নাই (সাহিত্য—সাধক-চরিতমালা নং ৪ গ্রন্থের ১৭, ২৬ পৃঃ দ্রঃ)।

৩০। 'কলিকাতা কমলালয়ের' ১৩৪৫ সংস্করণে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী, পৃষ্ঠা ।০।

৩১। চারিত্র পূজা—বিদ্যাসাগর চরিত, পৃঃ ২৩।

৩২। ১৩৬২ বাংলা সনে শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় বক্তৃতা

ঋগ্বেদের যুগে ভারতীয় নারী

প্রাচীন ভারতবাসীরা সাহিত্যের নানা বিভাগে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু নিজেদের ইতিহাস রচনার বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এইজন্য প্রাচীন ভারতের রাজনীতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই কম। কেবল প্রাচীন ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে অন্যান্য প্রাচীন দেশ অপেক্ষা আমাদের জ্ঞান অনেক বেশী। কারণ ভারতের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে ধর্মের অনেক তথ্য জানা যায়। প্রাচীন আর্যজাতি দেবদেবীর যজ্ঞ উদ্দেশ্যে তাঁহাদের স্তুতি করিতেন। এই সকল স্তুতিগুলি একত্র করিয়া ঋগ্বেদের সংহিতা অংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। সামাজিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ইহাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু তথ্য আছে। ইহা হইতেই আমরা ঐ যুগের আর্যজাতির সমাজ সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করিতে পারি। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে ঋগ্বেদ মূলতঃ ধর্মগ্রন্থ —ইহাতে সামাজিক জীবনযাত্রার কোন বিধিবদ্ধ বিবরণ নাই— কেবল গৌণভাবে কিছু কিছু উল্লেখ আছে। সুতরাং এবিষয়ে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ। তথাচ অন্য কোন প্রমাণ না থাকায় ইহার উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নাই। প্রাচীন আর্য সমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা কি ছিল এ সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদের উপর নির্ভর করিয়া যাহা জানা যায় তাহা বর্ণনা করাই আজিকার বক্তৃতার উদ্দেশ্য। মোটের উপর ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে ঋগ্বেদ সংহিতাতে সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা প্রায় চারি হাজার বৎসর পূর্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অর্থাৎ সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে প্রচলিত ছিল।

ঋগ্বেদ সংহিতায় অনেক দেবদেবীর উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ জগতের যে সমুদয় প্রাকৃতিক দৃশ্য বা শক্তি মানুষের মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ, মুগ্ধ বা আন্দোলিত করে তাহাদের জীবন্তরূপ কল্পনা করিয়া তাহার উপর দৈবভাব আরোপণপূর্বক এই সমুদয় দেবদেবীর সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন ঝড়, বৃষ্টি, বজ্র-বিদ্যুৎ প্রভৃতি ধ্বংসকারী শক্তি ইন্দ্র, রুদ্র, মরুৎ, বায়ু, পর্জন্য প্রভৃতি দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছে। প্রচণ্ড তেজোশালী ও আলোকের আধার সূর্য, সর্ববস্তু দহনকারী অগ্নি, অনন্ত বিস্তারশালী পৃথিবী, আকাশ ও সমুদ্র, অরুণ-রাগরঞ্জিত অপূর্ব সৌন্দর্যের আধার প্রভাতের ঊষা প্রভৃতি উপাস্য দেবদেবীরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এই সকল দেবদেবী উচ্চস্তরের মনুষ্যরূপেই কল্পিত হইয়াছেন—মানুষের ন্যায়ই তাঁহাদেরও ক্ষুধা তৃষ্ণাবোধ আছে—এবং যে ব্যক্তি এই সমুদয় প্রদান করিয়া তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করে তিনি তাহাদের অমঙ্গল দূর ও মঙ্গল সাধন করেন। অর্থাৎ এই সমুদয় দেবতা প্রকারান্তরে মানুষের আদর্শেই গঠিত হইয়াছেন। এই কথাটি স্মরণ রাখিলে আমরা সে যুগে নারীজাতির সম্বন্ধে আর্যগণের কিরূপ ধারণা ছিল তাহার কিছু আভাস পাই। কারণ ঋগ্বেদে বিভিন্ন দেবীর যে স্তুতি আছে তাহাতে মহিমামণ্ডিত নারীমূর্তির ছবিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আর্যগণের মনে নারীর প্রতি যে বিশেষ সম্ভ্রম ও মর্যাদার ভাব ছিল এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। দেবী অদিতি দেবগণের মাতৃরূপে কল্পিতা হইয়াছেন। তিনি কেবল তাঁহার সন্তান, মিত্র বরুণ, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাকে নহে জগতের সকলকেই আদর্শ জননীরূপে প্রতিপালন করেন, এবং তিনি আদর্শ গৃহিণী, কন্যা ও ভগিনী। মানুষের সর্ববিধ দুঃখ-দুর্দশা, পাপ অপরাধ হইতে তিনি মুক্তিদান করেন। ঋগ্বেদে (১।১৩৬।৩) তাঁহাকে 'জ্যোতিষ্মতী ধারয়ৎক্ষিতি' ও স্বর্বতীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—অর্থাৎ তিনি জ্যোতির্ময়ী, এই পৃথিবী

ধারণ করেন ও স্বর্গসুখ প্রদান করেন। সমগ্র ঋগ্বেদে ৮০ বার তাঁহার উল্লেখ আছে।

দেবী পৃথিবীও মাতারূপে পরিকল্পিতা হইয়াছেন এবং দ্যাবা-পৃথিবী অর্থাৎ স্বর্গ ও মর্ত্য এই যুগ্ম দেবদেবীর শক্তি ও মহিমা নানা সূক্তে উচ্ছ্বসিত ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। এই আদিম দেবদেবী অন্যান্য দেবগণের ও জগতের পিতামাতা এবং সকল আপদ-বিপদে মানুষের ত্রাতারূপে বর্ণিতা হইয়াছেন। প্রভাতের দেবী উষার সৌন্দর্য যে অপরূপ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে জগতের ধর্মগ্রন্থে তাহার তুলনা মিলে না। সুন্দরী যুবতী উষা নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া যেমন দেব ও মনুষ্য উভয়েরই মনোহরণ করেন তেমনি শক্তির আধার বাক্ নামে দেবী সমস্ত জগতের অধীশ্বরী ও দেবগণের শক্তি-দায়িনী। তিনি যাহা বলেন দেব ও মনুষ্য তাহাই পালন করে। তিনি যাহার প্রতি সদয় হন তাহাকেই সর্বপ্রধান সৃষ্টিকর্তা, ঋষি ও সুমেধা অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান করেন। দেবী ইন্দ্রাণী আদর্শ গৃহিণী—পতি ক্রুদ্ধ হইলেও তাহার বাক্য অমান্য করিতে অসক্ত। তিনিও ইন্দ্রের তুল্য তেজস্বিনী ও যশস্বিনী। আরও তিন দেবী—ইলা, সরস্বতী ও ভারতী—যজ্ঞবিধি, সর্ববিধ বিদ্যা ও জ্ঞান এবং বাগ্মিতার উৎস ও আদর্শরূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন।

যাঁহারা এই সকল দেবীর পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মনে যে নারীত্বের একটি উচ্চ ও মহান আদর্শ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করা যায় না। এই আদর্শ যে বাস্তব জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পূর্বোক্ত দেবীগণের মধ্য দিয়া মাতা গৃহবধূ, সুন্দরী যুবতী, বীর্যবতী নারী প্রভৃতি নানারূপের বিকাশই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রাচীন আর্য সমাজে যে নারীর খুব মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি উপস্থাপিত করা যাইতে পারে।

সেটি এই যে ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে পুত্র লাভের জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে—কিন্তু কন্যা লাভের জন্য এরূপ কোন প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই নেতিবাচক প্রমাণ হইতে স্ত্রীজাতির মর্যাদা সম্বন্ধে কোন নিশ্চিৎ সিদ্ধান্ত করা যায় না। আর্যগণ যখন প্রথমে এদেশে আসেন তখন এখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের সহিত প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইত। এই সমুদয় যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে তাঁহারা এদেশে বসবাস বা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন না। সুতরাং কন্যা অপেক্ষা পুত্রের প্রয়োজন বেশী ছিল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে পরবর্তী যুগের গ্রন্থে যেমন কন্যার জন্ম অবাঞ্ছনীয়, কন্যা দুঃখের হেতু, প্রভৃতি উক্তি আছে ঋগ্বেদে তাহা নাই।

সুতরাং ঋগ্বেদের যুগে দেবীগণের আদর্শ হইতে স্ত্রী জাতির মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে যে ধারণা হয় তাহা অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ নাই। ইহার সপক্ষে বড় প্রমাণ এই যে ঋগ্বেদে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উক্তি হইতে নারীজাতির অবস্থা যেটুকু আমরা জানি বা অনুমান করিতে পারি তাহা এই ধারণার অনুকূল। অতঃপর এই বিষয়টিই আলোচনা করিব।

ঋগ্বেদের যুগে সাধারণতঃ ১৬।১৭ বছর বয়সের পূর্বে কন্যার বিবাহ হইত না, এবং গৃহকর্মের সঙ্গে তাহাদের শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। পুত্রের ন্যায় কন্যারও উপনয়ন হইত এবং তাহারা যজ্ঞ করিতে পারিত (৮-৯১-১ ; ৫-২৮-১)। স্ত্রীলোকেরা যে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত স্ত্রীলোকের রচনা, এবং এই জন্য তাঁহাদিগকে ঋষি বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের সর্বানুক্রমণিকাতে এইরূপ কুড়িজন স্ত্রী-ঋষির ও তাঁহাদের রচনার তালিকা আছে। এই রচনাগুলি হইতে তাঁহাদের কবিত্বশক্তি ও পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সমুদয় বিদুষী রমণীগণের মধ্যে ঘোষার নাম বিশেষ ভাবে

উল্লেখযোগ্য। তিনি ঋষি কক্ষীবানের কন্যা। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩৯ ও ৪০ সংখ্যক সূক্ত তাঁহারই রচনা এবং অন্য কয়েকটি সূক্তেও তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঘোষা চর্মরোগে আক্রান্ত হইয়া পরিণত বয়স পর্যন্ত পিতার গৃহে ছিলেন এবং যুগ্মদেবতা অশ্বি-দ্বয়ের বরে আরোগ্য লাভ কবিয়া উপযুক্ত পতি লাভ করিয়াছিলেন (১-১১৭-৭)। তাঁহার রচিত সূক্ত দুইটিতে তাঁহার জীবনের এই করুণ কাহিনী উল্লিখিত আছে এবং একটি অনাথা অসহায়া নারীর আকৃতি চমৎকার রূপে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ভাবয়ব্য রাজার পত্নী রোমশার দাম্পত্য প্রেমালাপ তাঁহার রচিত সূক্তে স্থান পাইয়াছে (১-১২৬)। ইহাতে একটি তরুণীর হৃদয়ের প্রেমোচ্ছ্বাস কবিত্বময় ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। ঋষি অগস্ত্য ও তাঁহার পত্নী ঋষি লোপামুদ্রার যুক্ত রচনা একটি সূক্তে তাঁহাদের প্রেমালাপ এবং তাহা শ্রবণে লজ্জিত অগস্ত্যের এক শিষ্যের আত্মগ্লানি প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। স্ত্রী-ঋষি আপালা দুইটি সূক্তে অগ্নির এবং আর একটিতে ইন্দ্রের স্তুতি করিয়াছেন (১০-৯১, ৮-৮০)। স্ত্রী-ঋষি সূর্যা একটি সূক্তে (১০-৮৫) সোমের সহিত নিজের বিবাহের বর্ণনা করিয়াছেন। বিবাহ প্রসঙ্গে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে। বসুক্রের পত্নী একটি সূক্তের প্রথমাংশের ঋষি (১০-২৮-১)। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৬০ সংখ্যক সূক্ত একজন স্ত্রী-ঋষি ও তাঁহার পুত্রগণের রচনা। স্ত্রী-ঋষি ইন্দ্রাণীর দুইটি সূক্ত কবিত্বের সৌন্দর্যে সমুজ্জল (১০-১৪৫, ১৫৯) এবং সপত্নীর প্রতি বিদ্বেষভাবের অভিব্যক্তির চমৎকার দৃষ্টান্ত। ইনি যে দেবীর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ অনেকে সূক্ত রচনা করিয়া একাধারে ঋষি ও আরাধ্যা দেবীর মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। এইরূপ সূক্তের মধ্যে তিনটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রথমটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম সূক্ত। যম ও যমী এই দুই যমজ ভ্রাতা-ভগ্নীর কথো-

পকথন ইহার বিষয়বস্তু। দ্বিতীয়টি দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত, উর্বশী ও রাজা পুরূরবার কথোপকথন। এই তুইটি সূক্তকে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাহিত্যিক উৎকর্ষ ও বলিষ্ঠ নারীচরিত্রের অপূর্ব অভিব্যক্তি এই তুইটি সূক্তকে বিশেষ প্রসিদ্ধি দান করিয়াছে। .যমী ও উর্বশী এই তুইএর রচিত কথোপকথনের মধ্য দিয়া আমবা ঋগ্বেদের যুগেব নারীচরিত্রের যে অপূর্ব মহিমা, সৌন্দর্য ও একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণ দেখিতে পাই, বিশ্বের এই যুগের কোন প্রাচীন ইতিহাস বা সাহিত্যে তাহাব তুলনা মিলে না। সুতবাং এই তুইটি সূক্তের একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

দশম সূক্তেব দেবতা যম ও যমী এবং ঋষি যমী ও যম। (যম ও যমী যমজ ভ্রাতৃ-ভগিনী, তন্মধ্যে যমী যমকে কহিতেছেন): 'বিস্তীর্ণ সমুদ্রমধ্যবর্তী এই দ্বীপে আসিয়া এই নির্জন প্রদেশে তোমার সহ-বাসের জন্য আমি অভিলাষিণী, কারণ গর্ভাবস্থা অবধি তুমি আমার সহচর। বিধাতা মনে মনে চিন্তা করিয়া রাখিয়াছেন যে, তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদিগের পিতার এক সুন্দর নপ্তা (নাতি) জন্মিবে।'[১]

(যমের উত্তর)—তোমার গর্ভসহচর তোমার সহিত এ প্রকার সম্পর্ক কামনা করেন না। যেহেতু তুমি সহোদরা ভগিনী—অগম্যা।[২]

(যমীর উক্তি)—যদিচ কেবল মনুষ্যের পক্ষে এ প্রকার সংসর্গ নিষিদ্ধ, তথাপি দেবতারা এরূপ সংসর্গ ইচ্ছাপূর্বক করিয়া থাকেন। অতএব আমার যেরূপ ইচ্ছা হইতেছে, তুমিও তদ্রূপ ইচ্ছা কর।[৩]

... ...

(যমের উক্তি)—ভবিষ্যতে এমন যুগ হইবে যখন ভ্রাতা ভগিনীর সহিত সহবাস করিবে। হে সুন্দরী, এক্ষণে আমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর।[১০]

(যমীর উক্তি)—সে কিসের ভ্রাতা, যদি সে থাকিতেও ভগিনী

অনাথা হয়? সে কিসের ভগিনী, যদি সেই ভগিনী সত্ত্বেও ভ্রাতার দুঃখ দূর না হয়। আমি অভিলাষে মূর্ছিতা হইয়া এত করিয়া বলিতেছি, তোমার শরীরে আমার শরীরে মিলাইয়া দাও।[১১]

(যমের উত্তর)—ভগিনীতে যে ব্যক্তি উপগত হয় তাহাকে পাপী কহে। আমা ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত সুখ সম্ভোগের চেষ্টা দেখ।[১২]

(যমীর উত্তর)—হায়, যম, তুমি নিতান্ত দুর্বল পুরুষ দেখিতেছি। এ তোমার কি প্রকার মন, কি প্রকার অন্তঃকরণ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। রজ্জু যেরূপ ঘোটককে বেষ্টন করে, কিংবা যেরূপ লতা বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ অন্য নারী অনায়াসেই তোমাকে আলিঙ্গন করে, অথচ তুমি আমার প্রতি বিমুখ।[১৩]

(যমের উত্তর)—হে যমী, তুমিও অন্য পুরুষকে আলিঙ্গন কর। যেরূপ লতা বৃক্ষকে, তদ্রূপ অন্য পুরুষই তোমাকে আলিঙ্গন করুক। তাহারই মন তুমি হরণ কর, সেও তোমার মন হরণ করুক। তাহারই সহবাসের ব্যবস্থা স্থির কর, তাহাতেই মঙ্গল হইবে।[১৪]

দশম মণ্ডলের ৯৫ সংখ্যক সূক্ত দশম সূক্তের বিপরীত। দশম সূক্তে নারী পুরুষকে প্রার্থনা করিতেছে কিন্তু পুরুষ বিমুখ। ৯৫ সূক্তে রাজা পুরূরবা উর্বশীকে প্রার্থনা করিতেছেন কিন্তু উর্বশী বিমুখ। তবে দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। গন্ধর্ব কন্যা উর্বশী দুইটি শর্তে মর্ত্যের রাজা পুরূরবাকে বিবাহ করেন। কিছুদিন উভয়ে একত্রে বসবাস করেন এবং রাজার ঔরসে উর্বশীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে। কিন্তু গন্ধর্বগণের চক্রান্তে পুরূরবা অনিচ্ছায় ও নিজের অজ্ঞাতসারে উর্বশীর নিকট যে দুইটি শর্ত করিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গ করেন। সুতরাং উর্বশী শর্তভঙ্গের অজুহাতে পুরূরবাকে ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। এই উপলক্ষ্যে দুই জনের মধ্যে যে সুদীর্ঘ কথোপকথন হয় তাহাই ঋগ্বেদের সূক্তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পর পৃষ্ঠায় তাহা সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত করিতেছি:

(পুরূরবার উক্তি)—হে পত্নী, তোমার চিত্ত কি নিষ্ঠুর ! অতি শীঘ্র চলিয়া যাইও না। আমাদের উভয়ের কিঞ্চিৎ কথোপকথন আবশ্যক।

(উর্বশীর উক্তি)—তোমার সহিত বাক্যালাপ করিয়া আমার কি হইবে ? হে পুরূরবা, আপন গৃহে ফিরিয়া যাও। বায়ুকে যেমন ধারণ করা যায় না, তুমিও তেমনি আমাকে ধারণ করিতে পারিবে না।

(পুরূববার উক্তি)—তোমার বিরহে আমার তূণীর হইতে বাণ নির্গত হয় নাই ; আমি যুদ্ধে গমনপূর্বক শত সহস্র গাভী আনয়ন করিতে পারি নাই ; রাজকার্য বীরশূন্য হইয়াছে ; ইহার কোন শোভা নাই। আমার আর যে সব মহিলা ছিল তুমি আসিবার পর তাহারা আর আমার নিকট বেশভূষা করিয়া আসিত না।

(উর্বশীর উক্তি)—হে পুরূরবা, তোমার গৃহে আমি আগমন করিলাম, তুমি আমার অশেষ সুখের বিধাতা হইলে। কোনও সপত্নীর সহিত আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না ; আমাকেই নিয়ত সন্তুষ্ট করিতে। সর্বদা আমি তোমাকে কহিয়াছি যে কি হইলে আমি তোমার নিকট থাকিব না। তুমি তাহা শুনিলে না ; এক্ষণে পৃথিবী-পালন কার্য পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃথা বাক্য ব্যয় করিতেছ। হে নির্বোধ, গৃহে ফিরিয়া যাও, আমাকে আর পাইবে না।

(পুরূরবার উক্তি)—তবে তোমার প্রণয়ী (আমি) অদ্য পতিত হউক, আর কখনও যেন উত্থিত না হয়। সে বহু দূরে দূর হইয়া যাউক। সে নিরৃঋতির (অর্থাৎ মৃত্যুর) অঙ্কে শায়িত হউক। বলবান বৃক-(ব্যাঘ্র) গণ তাহাকে ভক্ষণ করুক।

(উর্বশীর উক্তি)—হে পুরূরবা, এরূপে মৃত্যু কামনা করিও না ; উচ্ছিন্ন যাইও মা, দুর্দান্ত বৃকেরা তোমাকে যেন ভক্ষণ না করে। স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্ত্রীলোকের হৃদয় আর বৃকের হৃদয় দুই এক প্রকার।

(পুরূরবার উক্তি)—হে উর্বশী, ফিরিয়া আইস। আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে।

উর্বশী কিন্তু ফিরিলেন না। চারি বৎসর পুরূরবার সহিত মর্ত্যে বাস করিয়াও অনায়াসে স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

এই দুইটি সূক্ত বিষয়বস্তুর দিক হইতে বিশেষ মূল্যবান। সহোদর ভ্রাতার নিকট প্রেমভিক্ষা আমাদের নিকট খুবই অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রাচীন মিশরে ভ্রাতার সহিত ভগ্নীর বিবাহ বহুদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। আর্য সমাজেও যে এককালে ইহা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ঋগ্বেদের যুগে তাহা নিন্দনীয় বিবেচিত হইত—যম-যমীর কথোপকথন হইতে এই সিদ্ধান্তই সমীচীন মনে হয়। এই পরি-প্রেক্ষিতে যমীর উক্তি তাহার চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় দেয়।

উর্বশী ও পুরূরবার প্রেমালাপ হইতে প্রাচীন সমাজের আর একটি অজ্ঞাত অধ্যায়ের পরিচয় পাই। অতি আদিম কালে বিবাহ-প্রথার প্রচলন ছিল না, নরনারীর অবাধ মিলন সম্পূর্ণ বিধিসম্মত বলিয়া স্বীকৃত হইত। পরবর্তী যুগে বিবাহপ্রথা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আজীবন এক সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপিত করে। পুরূরবা ও উর্বশীর বিবাহ এ দুয়ের মধ্যবর্তী—ইহা আজীবনের বন্ধন নহে, কারণ পুরূরবা কয়েকটি শর্ত স্বীকার করিয়া উর্বশীকে বিবাহ করেন, এবং শর্ত ভঙ্গ হইলেই বিবাহ বন্ধনও ছিন্ন হইবে ইহা তিনি জানিতেন। সুতরাং ইহাকে সাময়িক বিবাহ বা চুক্তির বিবাহ বলা যাইতে পারে। বর্তমানে আমেরিকায় যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ হইতেছে বলিয়া শোনা যায়, তাহা সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সুতরাং অতি আধুনিক হইলেও ইহা যে সম্পূর্ণ নূতন নহে ঋগ্বেদের উর্বশী-পুরূরবার কাহিনী হইতে তাহা জানা যায়।

ঋগ্বেদের এই সূক্তে নারীচরিত্রের একটি বিশেষ দিক ফুটিয়া

উঠিয়াছে। উর্বশী অপ্সরা, গৃহবধূ নহে। তিন চারি হাজার বছর পরে কবি রবীন্দ্রনাথ উর্বশীর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন—"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,"—ঋগ্বেদের উর্বশীও ঠিক তাই। ইনিও "ডানহাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে" রাজা পুরূরবাকে দেখা দিয়াছিলেন। চারি বৎসর উভয়ে স্বামী-স্ত্রীরূপে একসঙ্গে বাস করিলেন এবং একটি পুত্রের জন্ম হইল, তথাপি রাজার করুণ মিনতি ও শত অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করিয়া উর্বশী স্বচ্ছন্দে তাহাকে ছাড়িয়া গেলেন। 'যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "স্ত্রীলোকের হৃদয় আর বৃকের হৃদয় এক প্রকার"। অনেক বৈদিক পণ্ডিত উর্বশীর এই উক্তিটি হইতে ঋগ্বেদের যুগের স্ত্রীজাতির প্রকৃতি সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু উর্বশীকে সাধারণ স্ত্রীজাতির প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। উর্বশী স্বতন্ত্র শ্রেণীর স্ত্রীলোক—ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে এবং সাহিত্যিক প্রতিভায় যমী ও উর্বশী এক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

স্ত্রী-ঋষিদের যে সকল সূক্ত উল্লিখিত হইল তাহাতে তাঁহাদের গীতি-কবিতা ও নাট্য-কবিতা রচনায় দক্ষতার পরিচয় পাই। কিন্তু স্ত্রী-ঋষিরা যে গভীর দার্শনিক তত্ত্বেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন পূর্বোক্ত ঋষি বাক্ তাহার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের দেবতা আত্মা অথবা বাক্‌দেবী। অম্ভৃণ-কন্যা বাক্ ইহার ঋষি। একমাত্র বাক্‌দেবী হইতেই যে দেবতা, মনুষ্য, স্বর্গ, মর্ত্য ও চরাচরের সৃষ্টি হইয়াছে ইহাই এই সূক্তের প্রতিপাদ্য।

ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি: "আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যগণের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাদিগের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি। যে যজমান যজ্ঞসামগ্রী আয়োজন পূর্বক এবং সোমরস প্রস্তুত করিয়া দেবতাদিগকে উত্তমরূপে

সন্তুষ্ট করে, আমিই তাহাকে ধন দান করি। আমি রাজ্যের অধীশ্বরী, ধন উপস্থিত করিয়াছি, জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তুসকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। যিনি দর্শন করেন, প্রাণ ধারণ করেন, কথা শ্রবণ করেন, অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমার সহায়তাতে সেই সকল কার্য করেন। আমাকে যাহারা মানে না, তাহারা ক্ষয় হইয়া যায়। যাহাকে ইচ্ছা, আমি বলবান, অথবা স্তোতা, অথবা ঋষি, অথবা বুদ্ধিমান করিতে পারি। আমি দ্যুলোক ও ভূলোকে আবিষ্ট হইয়া আছি। আমি পিতা, আকাশকে প্রসব করিয়াছি। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান, সেই স্থান হইতে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই। আমার মহিমা এতাদৃশ বৃহৎ হইয়াছে যে, দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে।" এই সূক্তটি সে যুগের দার্শনিক চিন্তার চরমোৎকর্ষ। এক ভগবানের সত্ত্বাই যে চরাচর ব্যাপ্ত করিয়া আছে—এই দার্শনিক তত্ত্বের এরূপ অপূর্ব বিশ্লেষণ জগতের ইতিহাসে ইহার পূর্বে কেহ করে নাই। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ঋগ্বেদের "একো হি সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (ভগবান এক বিপ্রেরা তাহাকে নানা আখ্যা দেয়) এই মহান সূত্রের এই বিস্তৃত ভাষ্য যিনি করিয়াছেন তিনি একজন স্ত্রীলোক, এবং এই এক ভগবানও নারীরূপেই কল্পিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের যুগে নারীর মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা কত উন্নত ছিল এই সূক্তটি তাহার একটি চূড়ান্ত নিদর্শন।

এই যুগে স্ত্রীজাতির শিক্ষা-দীক্ষার যে বিবরণ পাই তাহাতে সহজেই অনুমিত হয় যে পরবর্তীকালের ন্যায় তাঁহারা অন্তঃপুরে আবদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে স্বাতন্ত্র্য-বর্জিত ছিলেন না। বর্তমান যুগের ন্যায় তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ছিল এবং তাঁহারা সমাজে অবাধে বিচরণ করিতেন ও সকল শ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সঙ্গে অবাধে মিশিতেন। ইহার বিশিষ্ট প্রমাণও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে 'বিদথ' শব্দটির উল্লেখ আছে। ইহার প্রকৃত অর্থ কি এ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। পণ্ডিতপ্রবর রথ (Roth), হুইটনী (Whitney) ও লাডউইগ (Ludwig) অনুমান করেন যে ইহা এক প্রকার সভা বা সমিতি— এখানে অনেক সাংসারিক ব্যাপার, ধর্ম ও যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হইত। স্ত্রীলোকেরা যে বিদথে যোগদান করিতেন এবং বক্তৃতা করিতেন, ঋগ্বেদে (১০·৮৫-২৬, ২৭) তাহার উল্লেখ আছে। যদি বিদথের পূর্বোক্ত অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে স্ত্রালোকের শিক্ষা-দীক্ষা অনেক উন্নত ছিল এবং তাঁহারা প্রকাশ্যে জনসভায় যোগ দিতেন এবং ইহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। ইহা যে সে যুগের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, ঋগ্বেদের আর একটি শব্দ ইহার সমর্থন করে। এই শব্দটি 'সমন' এবং ইহা বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং ইহা যে এক প্রকার উৎসব বা মেলা সূচিত করে সে সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একমত। কবিগণ এখানে স্বীয় কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিতেন, ধনুর্বিদ্যা-বিশারদগণ দক্ষতা দেখাইয়া পুরস্কার লাভ করিতেন, এবং এখানে ঘোড়-দৌড় প্রভৃতিও হইত। এই সকল আমোদ-প্রমোদ প্রায় সারা রাত ধরিয়া চলিত। এই উৎসবক্ষেত্রে বহু স্ত্রীলোকের সমাগম হইত—সকলেই বিশেষভাবে সাজসজ্জা করিয়া আসিত। তাহাদের মধ্যে অনেকে শুধু আনন্দ লাভের জন্য যাইত, কেহ কেহবা প্রার্থিত বরলাভের চেষ্টা করিত। গণিকাগণও ইহাতে যোগ দিত। প্রাচীনকালে গ্রীস দেশেও এইরূপ উৎসব হইত এবং তথায় অপরিচিত যুবক-যুবতীদের মিলনের সুযোগ হইত। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারত ও গ্রীসের এই প্রাচীন উৎসব-সভার সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের যুগে যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রেমসঞ্চার ও পরিণামে বিবাহের কাহিনীও আছে। কয়েকটি সূক্তের ঋষি শ্যাবাশ্ব ও রাজা

রথবীতি দাল্‌ভ্যের কন্যার প্রণয়-কাহিনী সমধিক প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদে এই কাহিনীর স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে কিন্তু সম্পূর্ণ কাহিনীটি পরবর্তী-কালে রচিত বৃহদ্দেবতাতে যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রায় বর্তমান্ যুগের উপন্যাসের মত। এই কাহিনীর মধ্যেই আর এক প্রণয়ী যুগলের অনুরূপ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের যুগে যে সঙ্গীতের বিশেষ চর্চা হইত সামবেদই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ সোমযজ্ঞে যে সমুদয় বৈদিক সূক্ত গান করা হইত সামবেদে তাহাই একত্রে সংকলিত হইয়াছে। সর্বকালে সর্বদেশে স্ত্রীলোকেরাই সঙ্গীত চর্চায় অগ্রণী হন। প্রাচীন বৈদিক যুগে যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই ঋগ্বেদেই তাহার প্রমাণ আছে। একটি সূক্তে (৯-৬৬-৮) বলা হইয়াছে, হে সোম, সাতটি স্ত্রীলোক অঙ্গুলিদ্বারা তোমাকে চালনা করিতে করিতে একস্বরে তোমার বিষয় গান করিল। আর একটি সূক্তে (৯-৫৬-৩) বলা হইয়াছে, কুমারীর স্বীয় প্রণয়ীর ন্যায় দশটি স্ত্রীলোক তোমাকে সঙ্গীতদ্বারা অভ্যর্থনা করিয়াছে। বর্তমান যুগে কনে দেখার সময় বরপক্ষ কন্যার সঙ্গীত-বিদ্যারও পরীক্ষা করেন, ঋগ্বেদের যুগেও বর স্বয়ং কন্যার এই বিদ্যায় তুষ্ট হইতেন। সঙ্গীতের সহিত নৃত্যকলায় স্ত্রীলোকের পারদর্শিতার উল্লেখও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। একটি সূক্তে (১-৯২-৪) বিশিষ্ট সাজসজ্জায় ভূষিতা উন্মুক্তবক্ষা নর্তকীর সহিত উষার তুলনা করা হইয়াছে। স্ত্রীজাতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে এইরূপ ও অন্যান্য যে সমুদয় উল্লেখ আছে বর্তমানযুগে তাহা অশ্লীল বা রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ঋগ্বেদের যুগে স্ত্রীলোকেরা কেবল নারীসুলভ নৃত্যগীত ও অন্যান্য সুকুমার শিল্পে নিপুণ ছিলেন তাহা নহে, কেহ কেহ যুদ্ধবিদ্যাও শিক্ষা করিতেন। ঋগ্বেদে কয়েকটি নির্ভীক যোদ্ধা-মহিলার উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রধানা ছিলেন খেল নামক রাজার রাণী বিশ্পলা।

তিনি স্বামীর সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া শত্রু সংহার করিয়াছিলেন। যুদ্ধে তিনি আহত হন—সম্ভবতঃ তাঁহার পায়ে বর্শার আঘাত লাগে এবং কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহার চলচ্ছক্তি রহিত হয়। পরে নূতন পা জোড়া দেওয়ার ফলে চলচ্ছক্তি ফিরাইয়া পান। ঋগ্বেদের পাঁচটি বিভিন্ন সূক্তে এই ঘটনার উল্লেখ আছে (১-১১৬-১৫ ; ১-১১১-১০ ; ১-১১৭-১১ ; ১-১১৮-৮ ; ১০-৩৯-৮)। ঋগ্বেদে আর একজন বীরাঙ্গনার নাম পাওয়া যায়—ইনি মুদ্‌গলের স্ত্রী মুদ্‌গলানী। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি স্বামীর রথের সারথি ছিলেন এবং শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া অনেক দ্রব্য লুণ্ঠন করেন (১০-১০১-২)। ঋগ্বেদে এইরূপ আরও কয়েকটি বীরাঙ্গনার উল্লেখ আছে (৫-৬১-৪,৫)।

সকল দেশে সকল যুগেই নারীর প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, ও সামাজিক মর্যাদার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার বিবাহিত জীবনে,—পত্নীরূপে। সৌভাগ্যের বিষয় ঋগ্বেদে এই সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

মানুষের সভ্যতার বিবর্তন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আদিম যুগে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না। পশু পক্ষী জন্তুদের ন্যায় নরনারীর অবাধ মিলনই তখনকার রীতি ছিল। মহাভারতের একটি কাহিনী হইতে জানা যায় যে ঋষি শ্বেতকেতু এই প্রথা রহিত করিয়া স্ত্রী পুরুষের বিবাহ প্রথার প্রচলন করেন (আদিপর্ব ১১৩।) সুতরাং আমাদের দেশেও যে প্রাচীনকালে তাহাদের অবাধ মিলনের ব্যবস্থা ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। পূর্বোক্ত যম-যমীর কথোপকথন এই আদিম রীতির আভাস দেয়। কিন্তু ঋগ্বেদের নানা সূক্ত হইতে জানা যায় যে সে যুগে বিবাহপ্রথা কেবল যে প্রচলিত ছিল তাহা নহে, ইহা একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানরূপে গণ্য হইত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে। আর্যগণ ভারতে আসিবার পূর্বেই যে

তাঁহাদের সমাজে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। তবে বর্তমানকালে আমরা বিবাহ বলিতে যাহা বুঝি, নানারূপ বিপর্যয়ের মধ্যদিয়া আর্য-সমাজে তাহা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। পরবর্তীকালে স্মৃতি শাস্ত্রে ও পুরাণে যে নয় প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে তাহাতেই এই অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বলপূর্বক অথবা নানা ছলে গোপনে কন্যা হরণ করিয়া তাহাকে বিবাহ করা রাক্ষস অথবা ক্ষাত্র ও পিশাচ নামে অভিহিত হইত। স্মৃতিতে ইহার উল্লেখ থাকিলেও সে যুগে ইহা নিন্দনীয় ছিল। পিতামাতার অজ্ঞাতসারে স্বেচ্ছায় যুবক-যুবতীর প্রেম ও মিলনের ফলে যে বিবাহ তাহা গান্ধর্ব বিবাহ নামে কথিত হইত। পিতামাতার ব্যবস্থা অনুসারে কন্যা সমাগত বহু প্রার্থীর মধ্যে একজনকে পছন্দ করিয়া বরমাল্য দিলে তাহা স্বয়ম্বর নামে পরিচিত হইত। অবশিষ্ট যে পাঁচরকম বিবাহের উল্লেখ আছে তাহার সবগুলিতেই পিতা যথারীতি মন্ত্র পড়িয়া নির্বাচিত বরের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতেন—কেবল শুল্ক আদান-প্রদানের প্রভেদ ছিল। বরের নিকট হইতে কেবল গোমিথুন গ্রহণ করিয়া কন্যাদান করিলে তাহাকে আর্ষ বলা হইত এবং বর স্বেচ্ছায় কন্যা ও তাহার আত্মীয় স্বজনকে প্রভূত অর্থ দানপূর্বক বিবাহ করিলে তাহার নাম হইত আসুর। সালঙ্কারা কন্যাকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা ঋত্বিকের হস্তে সম্প্রদান যথাক্রমে ব্রাহ্ম ও দৈব বিবাহ কথিত হইত। যে বিবাহে কন্যার পিতা বরকে অভ্যর্থনা করিয়া "তোমরা দুইজনে ধর্ম আচরণ কর" এই বাক্য দ্বারা বর কন্যাকে সম্ভাষণ করিতেন তাহার নাম ছিল প্রাজাপত্য বিবাহ।

ঋগ্বেদে এই সব বিভিন্ন বিবাহের নাম পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহার অনেকগুলিই বর্তমান ছিল। গান্ধর্ব বিবাহ যে প্রচলিত ছিল তাহা পূর্বোক্ত 'সমন' উৎসবের বিবরণ হইতেই বোঝা যায়। রাক্ষস

অথবা ক্ষাত্র বিবাহের একটি দৃষ্টান্ত ঋগ্বেদে আছে। যুবক বিমদ শত্রুকে পরাজিত করিয়া স্ত্রীলাভ করিয়াছিলেন (১-১১৬-১)। কিন্তু কমদ্যু নামা এই স্ত্রীর সহিত তাঁহার পূর্বেই প্রণয় ছিল—সুতরাং ইহা গান্ধর্ব বিবাহও বলা যায়। যুবক-যুবতীর গোপন মিলনের একাধিক উল্লেখ আছে (১০-৩৪-৫ ; ১-১৩৪-৫)—ইহাও গান্ধর্ব বিবাহের অস্তিত্ব সূচিত করে) একটি সূক্তে বলা হইয়াছে যে "তোমরা অযোগ্য জামাতা অথবা শ্যালক অপেক্ষাও অধিক বহুবিধ ধন দান কর"। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে সে যুগে বর কন্যাকে এবং কন্যা পক্ষ বরকে শুল্ক দিত-অর্থাৎ আসুর ও আর্ষ বিবাহ তো প্রচলিত ছিলই, তদতিরিক্ত বর্তমানকালের ন্যায় বর-পণ প্রথাও ছিল। কক্ষীবানের নব পরিণীতা বধূর যৌতুক—অশ্বযুক্ত দশখানি রথ ও এক সহস্র ষষ্টি সংখ্যক গাভী—তিনি পিতাকে দান করিয়াছিলেন (১-১২৬-৩)। আর একটি সূক্তে আছে যে অনেক স্ত্রীলোক কেবল অর্থের লোভ দেখাইয়া পতি-লাভ করে, কিন্তু যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যাহার শরীর সুগঠন, সে অনেক লোকের মধ্য হইতে আপনার মনোমত প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে (১০-২৭-১২)। ইহার তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই যে সুস্থ ও রূপগুণশালিনী সদ্বংশের কন্যা বহুলোকে প্রার্থনা করিত এবং সে তাহাদের মধ্য হইতে বর নির্বাচন করিত। ইহা স্বয়ম্বর বিবাহের সূচনা করে। সম্ভবতঃ কুরূপা কন্যার বিবাহ দিতে হইলে কন্যার পিতা বা ভ্রাতা বরপক্ষকে অনেক অর্থাদি প্রদানে সম্মত করাইতেন। আর একটি সূক্ত হইতে জানা যায় যে বর্তমানযুগের ন্যায় কন্যাপক্ষ অর্থ ছাড়াও শয্যা, অঙ্গপ্রসাধনের দ্রব্যাদি যৌতুক দিতেন (১০-৮৫-৭)। ঋগ্বেদের দুইটি সূক্তে রথ চালনার প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়া স্ত্রীলাভের কথা আছে (১-১১৬-১৭ , ১০-৮৫-১৪)। ইহাও সীতা ও দ্রৌপদীর ন্যায় এক প্রকার স্বয়ম্বরের সূচনা করে।

ঋগ্বেদের যুগে পরবর্তীকালের ন্যায় আর্যগণের মধ্যে জাতিভেদ গড়িয়া ওঠে নাই, সুতরাং অনুলোম-প্রতিলোম প্রভৃতি বিবাহবিধির কোন প্রশ্নই উঠিত না। আর্য ও অনার্যের মধ্যেও বিবাহ প্রচলিত ছিল। দাস-কন্যাকে বধূ বলা হইয়াছে (৮-১৯-৩৬; ৬৮-১৭; ৬-২৭-৮; ১-১৮-১)। ঋগ্বেদের অনেক ঋষি দাসী মাতার সন্তান ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কক্ষীবান, ঔশিজ, কাবষ (বৎস) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

ঋগ্বেদের সূক্তগুলি হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে সে যুগে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল না। সাধারণতঃ কন্যার যৌবনোদ্‌গমের পরই বিবাহ হইত। প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা কুমারীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দুই একটি উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে সে যুগে বাল্য বিবাহও প্রচলিত ছিল, কিন্তু এই সব যুক্তির অসারতা অনেকেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। একটি যুক্তি এই যে, ঋগ্বেদের একটি সূক্তে বধূকে অর্ভ বলা হইয়াছে (১-৫১-১৩)। কিন্তু আর একটি সূক্তে (১-১১৬-১) যুদ্ধে জয় করিয়া পত্নীলাভকারী বিমদকেও অর্ভগ বলা হইয়াছে। সুতরাং অর্ভ শব্দের সাধারণ অর্থ 'অল্পবয়স্ক' সর্বত্র প্রয়োজ্য নহে। ঋগ্বেদের অন্য যে দুইটি উক্তি বাল্য-বিবাহের সপক্ষে উদ্ধৃত হইয়াছে—বর্তমানকালের শ্লীলতা ও রুচি বজায় রাখিয়া তাহার আলোচনা সম্ভব নহে। কিন্তু তাহা যে বাল্য-বিবাহের অনুকূল যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না ইহা অনেকেই প্রমাণ করিয়াছেন। মোটের উপর ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, ঋগ্বেদে কন্যার যৌবনোদ্‌গমের পর বিবাহ হওয়ার বহু প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল এরূপ কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত বা প্রমাণ নাই।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সংখ্যক সূক্ত হইতে বিবাহের পদ্ধতি ও আদর্শ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। ইহার বিষয়বস্তু সূর্যার

বিবাহ। কিন্তু এই সুদীর্ঘ সূক্ত যে সে যুগের আর্য সমাজে প্রচলিত সাধারণ বিবাহেরই বর্ণনা এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং উপমা অলঙ্কার প্রভৃতি বাদ দিয়া এই সূক্ত হইতে বিবাহের সম্বন্ধে কি জানা যায় তাহার একটু বিস্তৃত বিবরণ দিতেছি।

বিবাহের পরে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিবার সময়ে পুরোহিতগণ যে আশীর্বাদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন তাহার মর্মার্থ এই: "হে কন্যা, তোমার পিতা যে বন্ধনের দ্বারা তোমাকে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই বন্ধন হইতে তোমাকে মোচন করিতেছি। যাহা সত্যের আধার, যাহা সৎকর্মের আবাসস্থানস্বরূপ, এইরূপ স্থানে তোমাকে নিরুপদ্রবে তোমার পতির সহিত স্থাপন করিতেছি। পতির গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হইয়া প্রভুত্ব কর। এই স্থানে সন্তান-সন্ততি জন্মিয়া তোমার প্রীতি লাভ হউক। এই গৃহে সাবধান হইয়া গৃহকার্য সম্পাদন কর, এই স্বামীর সহিত আপন শরীর সম্মিলিত কর, বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত নিজগৃহে প্রভুত্ব কর।'

এই আশীর্বচনের পর সুসজ্জিতা বধূ রথে চড়িয়া সহচরী ও দাসীগণ সমভিব্যাহারে পতিগৃহে যাত্রা করিলেন। তাহার পিতা যে প্রচুর উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহা অগ্রে অগ্রে চলিল। বধূ পতিগৃহে পৌঁছিলে, বহু লোক তাহাকে দেখিতে আসিবে—তাহাদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে "যাহারা বিপক্ষতাচরণ করিবার জন্য এই পতিপত্নীর নিকটে আসে তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হউক। এই বধূ অতি সুলক্ষণা, তোমরা আইস ইহাকে দেখ। সৌভাগ্য অর্থাৎ স্বামীর প্রীতিপাত্র হউক উহাকে এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন কর।"

অতঃপর বধূর প্রতি স্বামীর সম্বোধন এইরূপ: "তুমি সৌভাগ্য-বতী হইবে বলিয়া তোমার হস্তধারণ করিতেছি। আমাকে পতি পাইয়া তুমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও, এই প্রার্থনা করি। দেবগণ

আমার সহিত গৃহকার্য করিবার জন্য তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।”

তারপর বর ও বধূর প্রতি উক্তিঃ “হে বর বধূ, তোমরা এই স্বস্থানেই উভয়ে থাক, পরস্পর পৃথক হইও না, নানা খাদ্য ভোজন কর, আপন গৃহে থাকিয়া পুত্রপৌত্রদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ও ক্রীড়া বিহার কর।”

অতঃপর বধূর প্রতি বরের উক্তিঃ “প্রজাপতি আমাদিগের সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করিয়া দিন, অর্যমা আমাদিগকে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত মিলিত করিয়া রাখুন। হে বধূ, তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর। আমাদিগের দাসদাসী এবং আমাদিগের পশুগণের মঙ্গল বিধান কর। তোমার চক্ষু যেন দোষশূন্য হয়, তুমি পতির কল্যাণকারী হও, তোমার মন যেন প্রফুল্ল এবং লাবণ্য যেন উজ্জ্বল হয়। তুমি বীর-পুত্র-প্রসবিনী এবং দেবতাদিগের ভক্ত হও।”

তারপর ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনাঃ “হে ইন্দ্র, এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর। ইহার গর্ভে দশ পুত্র সংস্থাপন কর।”

বধূর প্রতি উক্তিঃ “তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাটের ন্যায় হও।”

উপসংহারে বর-বধূর উক্তিঃ “তাবৎ দেবতাগণ আমাদিগের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত করিয়া দিন। বায়ু ও ধাতা ও বাক্‌দেবী আমাদিগের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত করুন।”

যে সুদীর্ঘ সূক্তটির সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম তাহা একটি সুবিন্যস্ত রচনা নহে। নানা ভাবের নানা জনের উক্তি কোন মতে একত্রে গ্রথিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রচলিত কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন লোকগাথা হইতে অংশবিশেষ সংগ্রহ করিয়া সংকলন করা হইয়াছে। এইজন্য

ইহাতে ভাষা ও ভাবের পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু এই সূক্তের মাধ্যমে ঋগ্বেদের যুগের বিবাহিত জীবনের যে আদর্শ, মাধুর্য, আশা ও আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আজ পর্যন্তও হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের মূল ভিত্তি বলিয়া স্বীকৃত, এবং তিন সহস্র বৎসরের অধিক কাল হিন্দু সভ্যতাকে একটি বিশিষ্ট রূপ ও মূল্য দিয়াছে। প্রাচীন যুগের সমগ্র মনুষ্যজাতির ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই। স্ত্রীলোকের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার এরূপ আদর্শ ঋগ্বেদেব সমসাময়িক বা তাহার পূর্বেকার যুগে কোন জাতির মধ্যে ভাষায় রূপায়িত হইয়াছিল এরূপ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

পরিবারে পত্নীর স্থান যে খুব উচ্চ ছিল পূর্বোক্ত দীর্ঘ সূক্তটি ছাডাও ঋগ্বেদে নানা ভাবে নানা প্রসঙ্গে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। জায়াকে গৃহের ভূষণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (১-৬৮-৩)। পতি-পত্নীর প্রেমের কথা বহু সূক্তে বলা হইয়াছে। অনেক সূক্তের ঋষি দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন: "পতি যেমন অন্তরের সহিত পত্নীকে আহ্বান করে আমিও তোমাকে সেইরূপ আহ্বান করিতেছি।" "পতির প্রতি পত্নীর যে শ্রদ্ধা সেইরূপ শ্রদ্ধার সহিত আমি তোমার স্তুতি গান করিতেছি"। "পতি যেমন পত্নীকে ভালবাসে আমাদিগের স্তুতিও যেন তোমার সেইরূপ প্রিয় হয়।" "পত্নীর কণ্ঠস্বর যেমন পতির কর্ণে মধুর হয়, আমাদের স্তুতিও যেন তোমার কর্ণে সেইরূপ মধুর শোনায়। পতি যেমন পত্নীকে ভালবাসে তুমিও আমাদিগকে সেইরূপ ভালবাস"। এইরূপ বহু উক্তির মধ্যদিয়া পতি-পত্নীর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনন্ত প্রেম ও অবিচলিত বিশ্বাস পুনঃ পুনঃ প্রতি-ধ্বনিত হইয়াছে। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এইরূপ পতি-পত্নীর সম্বন্ধ-কল্পনা মধ্যযুগে বৈষ্ণবদের মধুর ভাবের সাধনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু এ আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে অনাবশ্যক।

ঋগ্বেদের যুগে ধর্মকার্যে পত্নী পতির প্রধান সহায় ছিলেন। গৃহে

যজ্ঞের পবিত্র অগ্নি অনির্বাণ রাখিবার দায়িত্ব তাঁহার উপরেই ন্যস্ত ছিল। পতি-পত্নী একত্র হইয়া অগ্নিকে হব্য দিতেন এবং নানা দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতেন। পত্নীর উপস্থিতি ভিন্ন যজ্ঞকার্য সম্পন্ন হইত না। পত্নীর 'সহধর্মিণী' এই সংজ্ঞাটি সত্য সত্যই সার্থক ছিল। একটি সূক্তে আছে—"প্রিয়যজ্ঞবিশিষ্ট এই দম্পতির স্তুতি দেবগণ কামনা করেন, ইহারা দেবতাকে সুখপ্রদ অন্ন প্রদান করেন এবং দেবগণের পরিচর্যা করেন (৮-৩১-৯)। কুমারী কন্যাও যজ্ঞের অধিকারিণী ছিলেন (৮-৯১-১ ; ৫-২৮-১)।

কিন্তু ঋগ্বেদের যুগে নারীজাতির মর্যাদা হানিকর কয়টি সামাজিক প্রথাও প্রচলিত ছিল। বিবাহের আদর্শ উচ্চ হইলেও পুরুষের বহুবিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। চিরন্তন রীতি অনুসারে সপত্নী-দিগের মধ্যে দ্বেষ, ঈর্ষা, কলহ প্রভৃতি যে পারিবারিক শান্তির বিঘ্ন ঘটাইত তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু স্ত্রীলোকের একাধিক পতি থাকিত এরূপ উক্তি ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন সূক্তে ইহার ইঙ্গিত বা আভাস আছে। একটি সূক্তে বলা হইয়াছে: "অসুর মরুৎগণের স্বকীয়া পত্নী রোদসী আলুলায়িত কেশে ও অনুরক্ত মনে মরুৎগণকে সংগমনার্থ সেবা করিতেছে। তরুণ বয়স্ক মরুৎগণ তরুণী রোদসীকে রথে স্থাপিত করিতেছেন। বলশালিনী রোদসী নিয়মক্রমে তাহাদের সহিত মিলিত হন" (১-১৬৭-৫, ৬)। এই সূক্তের চতুর্থ শ্লোকে "সাধারণী স্ত্রী"র উল্লেখ আছে। সায়নাচার্য তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'গণিকা'। কিন্তু ইহা বহু-ভর্তৃকা স্ত্রীলোকও বুঝাইতে পারে। রোদসী সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য। পূর্বে উল্লিখিত ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে যে বিবাহের বর্ণনা আছে তাহাতে কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে: "প্রথমে তোমাকে সোম বিবাহ করে, পরে গন্ধর্ব বিবাহ করে, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি, মনুষ্যসন্তান তোমার চতুর্থ পতি

(১০-৮৫-৪০)। কেহ কেহ মনে করেন যে ইহা স্ত্রীলোকের বহু-বিবাহপ্রথা সূচিত করে। একটি সূক্তে দুইজন পুরুষের এক স্ত্রীর উল্লেখ আছে (৮-১৯-৮)।

মহাভারতে পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ যে খুব প্রাচীন কালে নারীর বহু বিবাহের প্রমাণ অনেকেই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে দ্রৌপদীর পঞ্চপতির সহিত বিবাহ সম্বন্ধে সে যুগে এইরূপ প্রথা অপ্রচলিত বিধায় আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু যুধিষ্ঠির ইহার সমর্থনে দুইটি প্রাচীন দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছিলেন যথা, সাতজন ঋষি জটিলা গৌতমীর পতি ছিলেন এবং প্রচেতস্ দশ ভ্রাতা বার্ক্ষীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং ঋগ্বেদের যুগে নারীর বহু বিবাহ প্রচলিত থাকা অসম্ভব বলা যায় না—তবে ইহার নিশ্চিত প্রমাণ নাই।

ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্ত হইতে অনুমান করা হইয়াছে যে পতির মৃত্যুর পর বিধবা তাহার দেবরকে বিবাহ করিত। ইহার একটিতে মৃত পতির পার্শ্বে শয়ানা বিধবা ভ্রাতৃবধূকে দেবর বলিতেছে—'হে নারী, সংসারের দিকে ফিরিয়া চল। আমি মৃত ব্যক্তির হস্ত হইতে ধনু গ্রহণ করিলাম, ইহাতে আমাদিগের তেজঃ ও বললাভ হইবে।' (১০-১৮-৮,৯)। দ্বিতীয় সূক্তে অশ্বিদ্বয় দেবতাযুগলকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে "যেরূপ বিধবা রমণী শয়নকালে দেবরকে সমাদর করে, অথবা কামিনী নিজ কান্তকে সমাদর করে, যজ্ঞকালে তদ্রূপ সমাদরের সহিত কে তোমাদিগকে আহ্বান করে" (১০-৪০-২)। তৃতীয় সূক্তে আছে "ভর্তৃরহিতা নারী যেমন অভিমুখী হইয়া পুরুষের নিকট গমন করে" (১-১২৪-৭)। কিন্তু প্রথমটি হইতে দেবরের সহিত বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় না। অপর দুইটি বিধবার বিবাহ বা গোপন অভিসার সূচিত করে তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। দ্বিতীয় উক্তিটিতে বিধবা ও দেবরের পরেই

কামিনী ও কান্তের উল্লেখ থাকাতে গোপন অভিসারের ব্যাখ্যাই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। সুতরাং ঋগ্বেদের যুগে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল কিনা এবিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না।

মৃত পতির সহিত স্ত্রীর সহমরণ প্রথারও কোন স্পষ্ট উল্লেখ ঋগ্বেদে নাই। তবে পূর্বোক্ত শ্মশানে মৃত পতির পার্শ্বে শয়ানা সদ্যবিধবার উল্লেখ হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহা ঋগ্বেদের যুগে অপ্রচলিত প্রাচীন কালের সহমরণ প্রথার অস্তিত্ব সূচিত করে।

নিয়োগ প্রথা অর্থাৎ পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের দ্বারা নারীর সন্তান উৎপাদন সম্বন্ধেও ঋগ্বেদে স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই। তবে কেহ কেহ কতকগুলি সূক্ত হইতে ইহার অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন। পূর্বোক্ত দেবরের সহিত শয়ন (১০-৪০-২) ইহার একটি দৃষ্টান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে—কিন্তু ইহা গোপনে ব্যভিচারের বা দেবরের সহিত বিবাহের দৃষ্টান্ত বলিয়াও ধরা যাইতে পারে। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঋগ্বেদ সামাজিক ইতিহাস নহে—কতকগুলি স্তোত্রের সংকলন মাত্র। সুতরাং পরবর্তীকালে প্রচলিত সহমরণ ও নিয়োগ প্রভৃতি প্রথার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও এগুলি যে ঐ যুগে ছিল না একথা নিশ্চিত বলা যায় না।

পিতৃধনে কন্যার উত্তরাধিকার ছিল কিনা এ সম্বন্ধে কয়েকটি সূক্তে কিছু আভাস পাওয়া যায়। একটি সূক্তে আছে "হে ইন্দ্র যাবজ্জীবন পিতামাতার সহিত অবস্থিতা দুহিতা যেমন আপনার পিতৃকুল হইতেই ভাগ প্রার্থনা করে সেইরূপ আমি তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করি" (২-১৭-৭)। আর একটি সূক্তে আছে: "ঔরসপুত্র দুহিতাকে পৈতৃক ধন দেন না। তিনি উহাকে ভর্তার প্রণয়ের আধার করেন" (৩-৩১-২)। ইহার পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, পুত্রহীন পিতা সমর্থ জামাতাকে সম্মানিত করতঃ শাস্ত্রানুশাসনক্রমে দুহিতাজাত পৌত্র প্রাপ্ত হয়েন। অপুত্রক পিতা দুহিতার গর্ভ হইবে

বিশ্বাস করতঃ প্রসন্ন মনে শরীর ধারণ করেন—অর্থাৎ দৌহিত্রই অপুত্রক পিতার উত্তরাধিকারী। বর শ্যালকের নিকট বহু অর্থ পান এইরূপ কথা একটি সূক্তে আছে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই সকল উক্তি হইতে মনে হয় যে কুমারী কন্যা পিতৃধনের অংশ পাইত কিন্তু বিবাহিতা কন্যা ভ্রাতা বর্তমানে পৈতৃক ধনের অংশ পাইত না, তবে, ভ্রাতা তাহার বিবাহের ব্যয় বহন করিত। ভ্রাতা না থাকিলে কন্যার পুত্র মাতামহের উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হইত।

পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতির স্ত্রীলোকের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানি. ঋগ্বেদের যুগে তাহাদের তুলনায় ভারতীয় নারীর মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা সব দিক দিয়াই অনেক বেশী উন্নত ছিল। কিন্তু ঐ সমুদয়ের মধ্যে অনেক জাতির স্ত্রীলোকের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে —অপর পক্ষে ভারতীয় নারীর অবস্থা মধ্য যুগের শেষ পর্যন্ত ক্রমেই অবনতির দিকে চলিয়াছে। ইহা ভারতীয় সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য। আমার পরবর্তী তুইটি বক্তৃতাতে এই অপ্রিয় সত্যটি পরিস্ফুট হইবে।

তৃতীয় বক্তৃতা

স্মৃতি শাস্ত্রের যুগে ভারতীয় নারী

ঋগ্বেদের যুগ শেষ হইবার পর আরও দুই হাজার বছর বা তারও কিছু বেশী সময়কে ভারতের প্রাচীন বা হিন্দুযুগ বলা যাইতে পারে। এই সুদীর্ঘকাল হিন্দু সমাজে নারী জাতির প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার ক্রমশঃ অবনতি হয়। এই অবনতির মূল লক্ষণগুলি কিরূপে হিন্দু সমাজে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল প্রথমে তাহারই আলোচনা করিব।

সাধারণ ভাবে সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, এই ক্রমিক অবনতির মূল কারণ প্রধানতঃ তিনটি। প্রথমতঃ, স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে একটি অনুদার ভাবের উৎপত্তি ও বিকাশ। দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রীজাতির শিক্ষার অবনতি। তৃতীয়তঃ, কন্যার বাল্য বিবাহ। এই তিনটি কারণ অনেকটা পরস্পর-সংবদ্ধ, কিন্তু তথাপি ইহাদের পৃথক আলোচনা না করিলে বুঝিবার পক্ষে অনেক অসুবিধা হইবে।

যদিও স্মৃতি শাস্ত্রের যুগে অর্থাৎ হিন্দুযুগের শেষভাগে এই সকল অবনতির লক্ষণ সম্পূর্ণভাবে প্রকট হইয়াছিল, তথাপি ইহার সূত্রপাত হয় বহুশতাব্দী পূর্বেই এবং অনেক দিন ধরিয়া ধীরে ধীরে ভারতের সর্বত্র ইহাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। ঋগ্বেদ সংহিতার পরবর্তী সাহিত্যের সাহায্যে এই ক্রমবিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। রচনার কালানুসারে এই বিপুল সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরগুলির নিম্নলিখিত শ্রেণীভেদ করা যায়—

১। ঋগ্বেদের পরবর্তী যজু, সাম ও অথর্ব বেদের সংহিতা।

২। ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত এই চতুর্বেদের ভাষ্য গ্রন্থগুলি।

৩। আরণ্যক ও উপনিষদ।

৪। গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, মহাভারত, রামায়ণ।

৫। ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতি, কাব্য, নাটক প্রভৃতি।

ইহার প্রত্যেক শ্রেণীতেই বহুসংখ্যক পৃথক পৃথক গ্রন্থ আছে। সুতরাং এই সাহিত্যের আয়তন অতি বিশাল। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে এই বিপুল সাহিত্যের রচনাকাল খৃষ্ট জন্মের এক সহস্র বৎসর পূর্ব হইতে এক সহস্র বৎসর পর পর্যন্ত। অবশ্য এসম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। ঋগ্বেদের যুগে, পুত্র কন্যা অপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয় ছিল—তবে কন্যা অনাদৃত বা ঘৃণিত ছিল না ইহা পূর্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি। কিন্তু অথর্ববেদসংহিতার দুইটি সূক্তে এমন কয়েকটি মন্ত্রতন্ত্র ও যাগযজ্ঞের বিধি আছে যাহাতে কেবল পুত্র-সন্তানের জন্ম হইবে—এমন কি মাতৃগর্ভে কন্যার ভ্রূণ থাকিলেও তাহার পরিবর্তে পুত্রের ভ্রূণ স্থাপিত হইবে (৩-২১; ৬-১১)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭-১৩) বলা হইয়াছে স্ত্রী সখী, পুত্র জ্যোতি, কিন্তু কন্যা কষ্টদায়ক। মহাভারতেও (১-১৭৩-১০) ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই: "আত্মা পুত্রঃ সখী ভার্যা কৃচ্ছ্রংতু দুহিতা নৃণাম"। তৈত্তিরীয় সংহিতা (৬-৫-১০) ও মৈত্রায়ণী সংহিতায় (৪-৬-৪) দেখিতে পাওয়া যায় যে কন্যা জন্মিলে তাহাকে মাটিতে শোয়াইয়া রাখা হয়, পুত্র জন্মিলে তাহাকে কোলে তুলিয়া লওয়া হয়।

এই প্রভেদের কারণ কি তাহা বলা শক্ত। কেহ কেহ মনে করেন যে কন্যার বিবাহ দেওয়া অতি কষ্টকর ব্যাপার বলিয়াই লোকে পুত্র-সন্তান কামনা করিত—যেমন এখনও অনেকে করে। রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে যে সীতার বিবাহ-যোগ্য বয়স হইলে তাহার পিতা জনক অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন; কারণ, কন্যার পিতা যত বড় লোকই হউন না কেন কন্যার বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার সমপদস্থ এমন কি

নিম্নপদস্থ লোকের নিকটও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। পঞ্চতন্ত্রেও অনুরূপ উক্তি আছে—কন্যার পিতা হওয়া কষ্টের নিদান, কারণ প্রথমেই বিষম দুর্ভাবনা হয়—কাহার হাতে ইহাকে সম্প্রদান করিব —এবং বিবাহান্তে কন্যা সুখী হইবে কিনা। এই সমুদয় উক্তি যে যথার্থ এবং ইহা যে কন্যার জন্মে বিরূপ হওয়ার অন্যতম কারণ তাহা অস্বীকার করা যায় না। ঋগ্বেদের যুগে কন্যার বিবাহ দেওয়া এত কষ্টকর ছিল না। অন্ততঃ কন্যার বিবাহ অবশ্য কর্তব্য ছিল না, এবং অনেক কন্যা চির কুমারী অবস্থায় পিতৃগৃহে থাকিত ইহা পূর্ব বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং বিবাহ দেওয়ার কষ্টের জন্য কন্যার প্রতি বীতরাগের কারণ তত প্রবল ছিল না।

কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রতি বিরূপতার অন্য কারণও সম্ভবতঃ ছিল। যে যুগে ব্রহ্মচর্যপালন জীবনের পরম আদর্শ ছিল এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিই ছিল ইহার চরম লক্ষ্য, সে যুগে স্ত্রীজাতির সান্নিধ্য ইহার প্রধান অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হইবে ইহা অস্বাভাবিক নহে। যে কারণে খৃষ্টীয় সাধু-সন্তেরা বলিতেন—নারী নরকের দ্বার—হয়ত সেই কারণেই, ভারতেও স্ত্রীজাতির প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিরূপ ভাব জন্মিয়া ছিল। ইহা যে অযৌক্তিক ও অসঙ্গত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—কারণ এবিষয়ে পুরুষ ও নারী উভয়েরই দায়িত্ব তুল্যরূপ। কিন্তু মানুষ সর্বদা যুক্তি অনুসরণ করিয়া চলে না। ইহার সমর্থনে বলা যাইতে পারে যে অনুরূপ কারণে গৌতম বুদ্ধও প্রথমে স্ত্রীলোক-দিগকে প্রব্রজ্যা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং যখন অবশেষে ভিক্ষুনী-সংঘ প্রবর্তন করিলেন তখন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—'আমার ধর্মসম্প্রদায় সহস্র বৎসর পবিত্র থাকিত ; কিন্তু ইহার ফলে পঞ্চশত বৎসরের বেশী তাহার বিশুদ্ধতা থাকিবে না।'

কারণ যাহাই হউক, পুত্র ও কন্যার মধ্যে প্রভেদের ভাব বাড়িয়াই চলে। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-দেহের শুচিতা সম্বন্ধে একটি অসঙ্গত রকমের

উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সমুদয় কারণে কন্যার বাল্য-বিবাহের সূচনা হয়। ঋগ্বেদের যুগে যে কন্যার যৌবনোদ্‌গমের পরেই সাধারণতঃ বিবাহ হইত তাহা পূর্বের বক্তৃতায় বলা হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এবিষয়ে গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইল।

অধিকাংশ গৃহ্যসূত্রে বিবাহ অনুষ্ঠানের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে নববধূ যে ঋতুমতী তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু কোন কোন গৃহ্যসূত্রে নগ্নিকা অবস্থায়ই কন্যার বিবাহ দেওয়ার বিধি আছে। ইহার স্বাভাবিক অর্থ এই যে, যে বয়সে বালিকা নগ্না হইতে লজ্জা বোধ করে না সেই বয়সেই তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত। কেহ কেহ নগ্নিকা শব্দের ভিন্ন অর্থ করেন। এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক বর্তমান প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। কারণ, প্রায় সমসাময়িক বা অল্পকাল পরবর্ত্তী ধর্মসূত্রগুলিতে ঋতুমতী হইবার পূর্বেই কন্যাকে বিবাহ দিবার বিধি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। গৌতম-ধর্মসূত্রে বলা হইয়াছে যে, 'ঋতুমতী হইবার পূর্বেই কন্যার বিবাহ দিবে,—তবে কেহ কেহ বলেন বস্ত্র পরিধানের পূর্বেই কন্যার বিবাহ দিবে (প্রাগ্‌বাসসঃ প্রতিপত্তে-রিত্যেকে) (১৮—২১, ২৩)। বশিষ্ঠ-ধর্মসূত্রে বলা হইয়াছে যে পাছে কন্যা বিবাহের পূর্বেই ঋতুমতী হয় এই আশঙ্কায় পিতা কন্যাকে, যখন নগ্না হইয়া খেলাধুলা করে সেই অবস্থায়ই বিবাহ দিবে—কারণ ঋতুমতী কন্যা গৃহে থাকিলে পিতার পাপ হয় (১৭-৬৯, ৭০)। বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও (৪-১-১১) ঠিক এই কথাই আছে। এই সমুদয় ধর্মসূত্রের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ৫০০ হইতে ৩০০ বৎসরের মধ্যে —ইহাই অধিকাংশ পণ্ডিতদের অভিমত। সুতরাং ঐ সময়ের পূর্বেই যে কন্যার বাল্য-বিবাহ শাস্ত্রীয় বিধি বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তবে কার্যতঃ ইহার যে ব্যতিক্রম হইত ঐ ধর্মসূত্রেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। বৌধায়ন-ধর্মসূত্রে (৪-১-১২) আছে যে কন্যা ঋতুমতী হইবার তিন বৎসরের

মধ্যে পিতা যদি তাহার বিবাহ না দেন তবে তাঁহার ভ্রূণ-হত্যার পাতক হইবে। বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে (১৭-৬৭, ৬৮) আছে যে ঐরূপ অবস্থায় কন্যা নিজেই পতি নির্বাচন করিবে। তবে ব্যতিক্রম থাকিলেও বাল্যবিবাহপ্রথা যে হিন্দু সমাজে ক্রমশঃই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, পরবর্তী কালে রচিত ধর্মশাস্ত্রগুলি হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়।

বাল্যবিবাহের বিষময় ফল হইল প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ, কন্যাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগের অভাবে ক্রমশঃই তাহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাস হইল। দ্বিতীয়তঃ, অশিক্ষিতা অল্পবয়স্কা বধূ পতিগৃহে গিয়া আপনার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত না এবং সর্ববিষয়ে পরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। এইরূপে ঋগ্বেদের যুগের যে দুইটি বৈশিষ্ট্য—পত্নীর মর্যাদা ও উচ্চতম শিক্ষা—নারীকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সেই দুইটিই ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া স্ত্রীজাতির অবনতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। কিরূপে ধীরে ধীরে পত্নীর মর্যাদা হ্রাস পাইল ও উচ্চ শিক্ষার অবসান হইল অতঃপর তাহারই আলোচনা করিব।

পত্নীর মর্যাদা যে ঋগ্বেদের যুগের পরই কিরূপ দ্রুত গতিতে হ্রাস পাইতেছিল, পরবর্তী বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণে তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মৈত্রায়ণী সংহিতায় স্ত্রীলোক, মদ্য পান ও অক্ষক্রীড়া এই তিনটিকে এক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, এবং স্ত্রীলোক অসত্য ও নির্ঋতি (আপদ) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় স্ত্রীলোককে অসৎ পুরুষ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলা হইয়াছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে কার্যতঃ স্ত্রীলোকের মর্যাদা লাঘবের কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে। ইহাতে একটি যজ্ঞের বিবরণ আছে—পূর্বে পত্নী একাই তাহাতে হব্য দিতেন, কিন্তু তখন উহার জন্য পুরোহিত নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পূর্বে স্ত্রী-লোকেরা সভা-সমিতিতে যোগদান করিতেন তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে—এবং নির্দেশ দেওয়া

হইয়াছে যে স্ত্রী স্বামীর আহারের পরে নিজে ভোজন করিবে। যদিও শতপথ ব্রাহ্মণে স্ত্রীকে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী বলা হইয়াছে, তথাপি প্রকৃতপক্ষে ঐ যুগে যে স্ত্রীলোকের মর্যাদা পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শিক্ষার অবনতি যে ইহার একটি প্রধান কারণ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অতঃপর এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। বাল্য-বিবাহের ফলে অধিকাংশ কন্যা শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলেও, ঋগ্বেদ সংহিতার পরবর্তী যুগে বহুকাল পর্যন্ত যে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার আদর্শ বর্তমান ছিল তাহার বহুবিধ প্রমাণ আছে। অথর্ববেদে বলা হইয়াছে যে বৈদিক অধ্যয়ন দ্বারাই কন্যা যুবক বর লাভ করে (১১-৫-১৮)। শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যাঁহারা আজীবন দর্শন, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা করিতেন তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবাদিনী বলা হইত। যাঁহারা বিবাহের কাল পর্যন্ত বিদ্যাচর্চা করিতেন তাঁহাদিগকে বলা হইত সদ্যোদ্বাহা। এই সময়ের মধ্যে তাঁহারা বৈদিক স্তোত্রাদি শিক্ষা করিতেন এবং পত্নীরূপে সন্ধ্যাবন্দনা যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক ধর্মানুষ্ঠান শুদ্ধ ভাবে সম্পন্ন করিতেন। ব্রহ্মবাদিনীরা কিরূপ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেন তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। কাশকৃৎস্ন নামে একজন পণ্ডিত মীমাংসা শাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। যে সমুদয় স্ত্রীলোক ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন, মহাভাষ্য ব্যাকরণের একটি সূত্র অনুসারে তাঁহাদের সাধারণ সংজ্ঞা ছিল কাশকৃৎস্না (মহাভাষ্য ৪-১-১৪ ; ৩, ১৫৫)। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, দুরূহ ও নীরস মীমাংসা শাস্ত্রের অধ্যয়নও স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কোন বিষয়ে বহু ছাত্রী না হইলে তাহাদের জন্য এরূপ একটি বিশেষ সংজ্ঞার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। যে যুগে মীমাংসার ন্যায় কঠিন শাস্ত্রে এত অধিক সংখ্যক ছাত্রী আকৃষ্ট হইত, সে যুগে উচ্চশিক্ষিতা

ছাত্রীর সংখ্যা যে খুব বেশিই ছিল এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

এইরূপে কেবলমাত্র ব্যাকরণের সূত্র হইতে সেকালের নারী-জাতির উচ্চশিক্ষার আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কৃতে 'উপাধ্যায়' শব্দের অর্থ অধ্যাপক। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (৩-৩-২১ ; ৪-১-৪৯) ইহার স্ত্রীলিঙ্গে তিনটি পৃথক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—উপাধ্যায়ানী, উপাধ্যায়ী ও উপাধ্যায়া। কেবলমাত্র উপাধ্যায়ের স্ত্রী বুঝাইতে হইলে উপাধ্যায়ানী শব্দ ব্যবহৃত হইত ; কিন্তু যে স্ত্রীলোক নিজে উপাধ্যায় অর্থাৎ অধ্যাপকের কার্য করিতেন তাঁহাকে উপাধ্যায়ী অথবা উপাধ্যায়া বলা হইত। খুব বেশী সংখ্যক স্ত্রীলোক অধ্যাপিকার বৃত্তি গ্রহণ না করিলে তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ দুইটি পৃথক শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন হইত না।

বৈদিক যুগের শেষভাগে উচ্চ দার্শনিক জ্ঞানের অধিকারিণী কয়েকটি মহিলার নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে আত্রেয়ী নামে একজন বেদান্ত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। উপনিষদের যুগে নারীরা যে এই নূতন দার্শনিক শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে কথিত হইয়াছে যে, বিদেহরাজ জনকের যজ্ঞস্থলে কুরু-পাঞ্চাল দেশের বহু ব্রাহ্মণের সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও জ্ঞানী তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য তিনি সহস্রটি ধেনু এবং প্রত্যেকের শৃঙ্গে দশপাদপরিমিত স্বর্ণ রাখিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণদের বলিলেন, 'আপনাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী (ব্রহ্মিষ্ঠ) তিনি এই গোসহস্র গ্রহণ করুন।' যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার শিষ্যকে আদেশ দিলেন 'এই ধেনুগণকে লইয়া যাও।' তখন অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা কুপিত হইয়া একে একে তাঁহার সহিত দার্শনিক বিচার আরম্ভ করিলেন। পাঁচজন ব্রাহ্মণ তর্কে পরাস্ত হইবার পর, গার্গী বাঁচক্নবী নামক মহিলা-পণ্ডিত যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকক্ষণ

পর্যন্ত প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদানের পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "গার্গী, দেবতা সম্বন্ধে আর বেশী প্রশ্ন করিও না, তোমার মাথা ঘুরিয়া যাইবে।" তখন গার্গী নিবৃত্ত হইলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গীর আর একটি শাস্ত্রীয় তর্কাতর্কির বিবরণও এই উপনিষদে আছে। সে যুগে যে স্ত্রীলোকেরা উচ্চ দার্শনিক জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন এবং প্রকাশ্য সভায় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের সঙ্গে সমকক্ষের ন্যায় তর্ক করিতেন, গার্গীর আখ্যান হইতে তাহা জানিতে পারি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২-৪ ; ৪-৫) মৈত্রেয়ীর আখ্যানও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। পূর্বোক্ত যাজ্ঞবল্ক্যের দুইটি স্ত্রী ছিলেন— মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। তিনি সংসার ত্যাগ ও বাণপ্রস্থ অবলম্বনের সংকল্প করিয়া মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, 'আমি যাইবার পূর্বে আমার যাহা কিছু আছে তাহা তোমার ও কাত্যায়নীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিব'। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি যদি রত্নপরিপূর্ণা পৃথিবীর অধীশ্বরী হই তাহা হইলে কি আমি অমৃতত্ব (অমরত্ব) লাভ করিতে পারিব'? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, 'না, তুমি ধনীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে পারিবে, কিন্তু ধনের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না।' তাহাতে মৈত্রেয়ী বলিলেন, 'যাহা দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি অমৃতত্ব সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিন'। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'তুমি সত্যই আমার প্রিয়া এবং প্রিয় কথাই বলিয়াছ।' অতঃপর আত্মা সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর যে আলোচনা হইল বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। সে যুগে স্ত্রীলোকদের যে কেবল দার্শনিক জ্ঞান ছিল তাহা নহে, তাঁহাদের জীবনও যে অধ্যাত্মবাদের উচ্চ আদর্শে পরিচালিত হইত, যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ হইতে আমরা তাহা জানিতে পারি। বৃহদারণ্যক উপনিষদের গার্গী ও মৈত্রেয়ী এই দুইটি মহীয়সী মহিলার আখ্যান প্রাচীন ভারতের

নারীজাতিকে যে সমুজ্জ্বল মহিমায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, জগতের প্রাচীন ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলে না।

উপনিষদের যুগে যে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা প্রচলিত ছিল তাহার আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণও বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়া যায়। কোন বিশেষ রকমের সন্তান লাভ করিতে হইলে স্ত্রীর ঋতুস্নানের পর স্বামী-স্ত্রীর কিরূপ খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে, এই উপনিষদে তাহার একটি দীর্ঘ তালিকা আছে। এই প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে যদি কোন পিতা 'পণ্ডিতা' ও 'দীর্ঘজীবিনী' কন্যা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি সস্ত্রীক সঘৃত তিলোদন ভোজন করিবেন। যদি কেহ পণ্ডিত পুত্র পাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে কি ভোজন করিতে হইবে, ইহার ঠিক পরেই তাহার উল্লেখ আছে। সুতরাং এই দুইটি বাক্যে 'পণ্ডিত' ও 'পণ্ডিতা' শব্দ যে সাধারণ অর্থাৎ বিদ্বান ও বিদুষী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবসর নাই। কিন্তু শঙ্করাচার্য এই উপনিষদের উক্তপদের টীকায় লিখিয়াছেন যে কন্যা সম্বন্ধে যে 'পণ্ডিতা' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার অর্থ "গৃহকার্যে নিপুণা"—কারণ স্ত্রীলোকের বেদ পাঠ নিষিদ্ধ সুতরাং তাহাদের বিদুষী হওয়ার কল্পনা করা যায় না। শঙ্করাচার্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, তাঁহার ন্যায় মেধাবী ভারতবর্ষে আর কেহ জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রায় দেড় হাজার বছর পরে জন্মিয়াছিলেন এবং তাহার বহু পূর্বেই স্ত্রীলোকের জ্ঞানচর্চা প্রায় লোপ পাইয়াছিল। সুতরাং সংস্কারমুক্ত যুক্তিমার্গ-পরিচালিত আধুনিক যুগে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে শঙ্করের ন্যায় পণ্ডিতও যুগোচিত সংস্কারের প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। ইহা ভিন্ন শঙ্করাচার্যের 'পণ্ডিতা' শব্দের অপব্যাখ্যার আর কোন যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়া যায় না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে উপনিষদের টীকায় শঙ্কর লিখিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের বেদপাঠ নিষিদ্ধ

সুতরাং কন্যা বিদুষী হইতে পারে না, সেই উপনিষদেই গার্গী ও মৈত্রেয়ীর কাহিনী আছে। শঙ্করাচার্যের কালে—অর্থাৎ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দে—দেড় হাজার বছরের ব্যবধানে কেবল যে স্ত্রীশিক্ষার এই অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা নহে—এ সম্বন্ধে সংস্কারও এমন দৃঢ়মূল হইয়াছে যে শঙ্করাচার্যের মত পণ্ডিতের ধীশক্তিও তাহার নিকট পরাভূত হইয়াছে। অথচ 'শঙ্কর-দিগ্বিজয়' গ্রন্থে আছে যে শঙ্করাচার্যের সহিত মণ্ডনমিশ্রের যে শাস্ত্রবিচার হয়, তাহাতে মধ্যস্থ অথবা বিচারক ছিলেন মণ্ডন মিশ্রের বিদুষী স্ত্রী। এই প্রবাদের মূলে কোন সত্য আছে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে, কারণ বেদপাঠে অনধিকারিণী কোন নারীর পক্ষে শঙ্কর ও মণ্ডন মিশ্রের তর্কের তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া মতামত প্রকাশ করিবার শক্তি থাকিতে পারে ইহা স্বীকার করা কঠিন। আর মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রীর পাণ্ডিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াও শঙ্কর 'কন্যার বিদুষী হওয়া অসম্ভব' এইরূপ মত প্রকাশ করিবেন, ইহা বিশ্বাস করা আরও কঠিন।

শঙ্করের প্রায় সমকালীন নারদস্মৃতির টীকাকার 'অসহায়' লিখিয়াছেন: "স্ত্রীলোকের শাস্ত্র অধ্যয়নে অধিকার নাই—এবং ধর্ম ও অধর্ম জ্ঞান কেবল শাস্ত্র পাঠেই জন্মে—সুতরাং এইরূপ জ্ঞানের অভাবের জন্যই তাহাদের স্বাতন্ত্র্য অবিধেয়।"

উপনিষদের পরবর্তী স্মৃতি রচনার যুগেই, অর্থাৎ প্রায় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে, সর্বপ্রথম স্ত্রীজাতির বেদপাঠে অনধিকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে: "বৈদিক মন্ত্রাদি সহকারে যেসকল জাতক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হয় স্ত্রীলোকের তাহাতে অধিকার নাই—ইহাই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। স্ত্রীলোকেরা নিরিন্দ্রিয় ও মন্ত্রহীন, সুতরাং অসত্যের ন্যায় অশুভ"। মূল শ্লোকটি এই:

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মে ব্যবস্থিতিঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতিঃ॥ (৯-১৮)

অমন্ত্রা শব্দের অর্থ শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে অনভিজ্ঞা। নিরিন্দ্রিয় শব্দের অর্থ খুব স্পষ্ট নহে। কোন কোন টীকাকার বলেন ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ প্রমাণ, সুতরাং 'নিরিন্দ্রিয়া' এই বিশেষণের অর্থ ধর্মের প্রমাণ শ্রুতি, স্মৃতিব জ্ঞান যাহাদের নাই (কুল্লুক, রাঘবানন্দ)। ইঁহারা অমন্ত্রা শব্দের অর্থ করেন—পাপ দূর করিবার জন্য মন্ত্রজপ প্রভৃতিব অধিকার যাহাদের নাই। আবার কেহ কেহ অমন্ত্রা শব্দের এই অর্থ স্বীকার করিয়া নিরিন্দ্রিয়া শব্দের অর্থ করেন, যাহাদের ইন্দ্রিয় অর্থাৎ বীর্য, ধৈর্য, প্রজ্ঞা, বল প্রভৃতি নাই। মোটের উপর মনুসংহিতার এই শ্লোক হইতে বেশ বুঝা যায় যে সে যুগে স্ত্রীলোকের বেদাদি শাস্ত্র পাঠ নিষিদ্ধ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে তাহাব যাগ যজ্ঞাদি করার অধিকারও লোপ পাইয়াছে, এবং মনুস্মৃতিতে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে (৪-২০৫ ; ১১-৩৬)। আবার এই শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবহেতু স্ত্রীলোকের চরিত্রে বহু মহৎ গুণের অভাব পরিকল্পিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ ও মনুসংহিতার রচনাকাল যথাক্রমে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম এবং খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী ধরা যাইতে পারে। সুতরাং এই পাঁচ সাত শত বৎসরের মধ্যেই স্ত্রীলোকের শিক্ষা-দীক্ষায় এই গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল।

কিন্তু এই যুগের শেষে এবং ইহার পরও যে কোনও কোনও স্ত্রীলোক উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেন তাহার কিছু কিছু প্রমাণ আছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত হালের 'গাথা-সপ্তশতী' নামক কবিতা-সংগ্রহ গ্রন্থে যে সমুদয় কবির রচনা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সাতজন মহিলা কবির নাম পাওয়া যায়—রেবা, রোহা, মাধবী, অনুলক্ষ্মী, পহঈ, বদ্ধবহী এবং শশীপ্রভা। ইহারা মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় কবিতা লিখিযাছেন। 'শুক্তিমুক্তাবলী' নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবিতা-সংগ্রহের গ্রন্থে রাজশেখরের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে

তিনজন মহিলা কবির প্রশংসা আছে। প্রথম, পঞ্চালদেশীয়া শীল-ভট্টারিকা—ইঁহার রচনা শব্দ ও অর্থের সামঞ্জস্যের জন্য প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয়, লাট অর্থাৎ গুজরাট দেশীয়া কবি দেবী—ইনি মৃত্যুর পরেও লোকের হৃদয়ে বিরাজ করেন। তৃতীয়, কর্ণাট দেশীয়া বিজয়াঙ্কা সরস্বতীর ন্যায় এবং মহাকবি কালিদাসের পরেই তাঁহার স্থান। রাজশেখরের মতে যাঁহারা সরস্বতীকে শুক্লবর্ণা বলিয়া বর্ণনা করেন তাঁহারা ভ্রান্ত, কারণ তাহা হইলে সরস্বতীর অবতার বিজয়াঙ্কার গাত্রবর্ণ শ্বেতপদ্মের মত না হইয়া নীল পদ্মের মত হইল কেন? রাজশেখরের পত্নীও কবি ও সাহিত্য সমালোচক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রাজশেখর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক। সুতরাং উপরোক্ত মহিলা কবিগণ ইহার পূর্বেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

নবম শতাব্দীতে রচিত কাব্য-মীমাংসায় বলা হইয়াছে যে রাজপুত্রী ও মহামাত্র-দুহিতাগণ, অর্থাৎ রাজা ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর কন্যাগণ, গণিকাবৃন্দ ও কৌটুম্বিক ভার্যাগণের মধ্যে কবি ও শাস্ত্রপ্রহিতবুদ্ধি অর্থাৎ শাস্ত্রদ্বারা পরিমার্জিত বুদ্ধি-সম্পন্না স্ত্রীলোক দেখা যায়। ইহাতে প্রকারান্তরে সাধারণ স্ত্রীলোকদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার অভাব সূচিত হইয়াছে এরূপ অনুমান খুব অসঙ্গত নহে। কৌটুম্বিক ভার্যার অর্থ সম্ভবতঃ সম্পন্ন পরিবারের স্ত্রীলোক। শাস্ত্র কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলা যায় না। যদি সাধারণ অর্থে শ্রুতি, স্মৃতি অর্থ ধরা যায় তাহা হইলে পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকের বেদপাঠ নিষেধের সহিত সঙ্গতি রক্ষা হয় না। অন্যথা বলিতে হয় যে, সাধারণ নিষেধ সত্ত্বেও স্ত্রীলোকের বেদাদি চর্চা একেবারে রহিত হয় নাই। এই ব্যাখ্যা বাৎস্যায়নের কামসূত্রদ্বারা সমর্থিত হয়। এই গ্রন্থের সূচনায় বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যেহেতু শাস্ত্রাধ্যয়ন স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ অতএব স্ত্রীলোকদের শিক্ষার

জন্য এই কামসূত্র লেখার কোন প্রয়োজন নাই। দুইটি যুক্তিদ্বারা তিনি এই আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। প্রথমতঃ কোন শাস্ত্র নিজে অধ্যয়ন না করিলেও ঐ শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট হইতে জানা যায়—ব্যাকরণ, জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতি নিজে অধ্যয়ন না করিলেও যাহারা এই সমুদয় শাস্ত্রে অভিজ্ঞ তাহাদের নিকট হইতে ইহাদের প্রয়োগ শিক্ষা করা যায়। কামশাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধে স্ত্রীলোকেরা এইভাবে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে (১-১-৭)। বাৎস্যায়নের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে গণিকা, রাজপুত্রী ও মহামন্ত্রি-দুহিতাগণ নিজেরাই শাস্ত্র পাঠ করিতে পারে। কামসূত্রের রচনাকাল কেহ কেহ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী(১) এবং কেহ কেহ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দী(২) বলিয়া অনুমান করেন। সুতরাং এই কাল হইতেই স্ত্রীলোকের শাস্ত্রপাঠ নিষিদ্ধ হইয়াছিল—কিন্তু তখনও এবং অন্ততঃ নবম শতাব্দী পর্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাগণ শাস্ত্র পাঠ করিতেন। এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য যে কাব্য মীমাংসা কামসূত্রের উক্তিটি হুবহু উদ্ধৃত করিয়াছেন, কেবল কৌটুম্বিক-ভার্যা যোগ করিয়াছেন।

স্ত্রীলোকেরা যে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন তাহার প্রমাণ আছে। খলিফা হারুণ অল রসীদের (৭৮৫-৮০৯ খ্রীঃ) আদেশে ভারতীয় নারীরচিত একখানি আয়ুর্বেদ গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। এই নারীর নাম আরবী অক্ষরে 'রুষা' বলিয়া লিখিত হইয়াছে।(৩) পূর্বোক্ত শাস্ত্র চর্চা এই শ্রেণীর শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে।

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে নারীজাতির যে চৌষট্টি প্রকার শিল্প-কলা চর্চার উল্লেখ আছে (১—৩) তাহার মধ্যে গীত, বাদ্য, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, মাল্যগ্রন্থন, সুগন্ধি দ্রব্য, খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করণ, নানাবিধ ইন্দ্রজাল বিদ্যা, উৎকৃষ্ট আবৃত্তি, নাটক ও আখ্যায়িকা সম্বন্ধে

জ্ঞান, কাব্য সমস্যা পূরণ, তক্ষণ বিদ্যা, বাস্তু বিদ্যা, রূপ্য ও রত্ন পরীক্ষা, ধাতুশোধন বিদ্যা, মণি স্ফটিক প্রভৃতির রঞ্জন বিদ্যা, বৃক্ষায়ুর্বেদ, মেষ-কুক্কুট-শাবক-যুদ্ধ-বিধি, গুপ্ত লেখা পাঠ, নানাদেশীয় ভাষা শিক্ষা, কাব্য-রচনা, অভিধান, কোষ, ছন্দ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি অধ্যয়ন, এবং শারীরিক ব্যায়াম প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চৌষট্টি কলার তালিকা পাঠ করিলে সে যুগের স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রীচরিত্রের আদর্শ যে খুবই উচ্চ ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। এই যুগে স্ত্রীলোকগণ যে সামরিক বিদ্যা শিক্ষা করিতেন বাৎস্যায়নের কামসূত্রে তাহার উল্লেখ আছে। রাজাদের যে স্ত্রী-রক্ষীদল ছিল মেগাস্থিনিস তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, প্রাচীন সংস্কৃত নাটকেও তাহার উল্লেখ আছে।

বাৎস্যায়নের কামসূত্র এবং কাব্যমীমাংসা পড়িলে মনে হয় যে, যে যুগে স্মৃতিশাস্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল সেই যুগে, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে প্রায় হিন্দু যুগের শেষ পর্যন্ত, নারী উচ্চ শিক্ষা লাভ করিত, কিন্তু এরূপ শিক্ষিতার সংখ্যা খুব বেশী ছিল না—কারণ এই শিক্ষা সাধারণতঃ সম্ভ্রান্ত পরিবারেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঋতুমতী হইবার পূর্বে কন্যার বিবাহপ্রথার ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ বালিকা-বধূর পক্ষে উচ্চ শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। ফলে প্রথমে উপনয়ন প্রভৃতি যে সমস্ত সংস্কারে বৈদিক মন্ত্রের পাঠ আবশ্যক ছিল, স্ত্রীলোকের সে সমস্ত সংস্কার রহিত হইল। এই ভাবে বহুদিন চলার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই স্ত্রীলোকের বেদপাঠ বা বেদমন্ত্র উচ্চারণের অধিকার নাই এই ধারণাই সমাজে বদ্ধমূল হইল এবং স্ত্রীলোক এ বিষয়ে শূদ্রের পর্যায়-ভুক্ত হইল। শিক্ষা ও শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবে বালিকা-বধূ নিজে শুভাশুভ বিবেচনা করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে না এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধীন করা হইল।

ঋগ্বেদের যুগে নববধূ পতিগৃহে আসিয়া সকলের উপর কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করিত, কিন্তু আট দশ বৎসরের বালিকা-বধূ সে অধিকার স্থাপন করিতে পারিত না। ইহার ফলে যে পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হইত, থেরীগাথা নামক বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের আত্ম-চরিতে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। বালিকা-বধূর প্রতি শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর অত্যাচার অনেক সময় সীমা ছাড়াইয়া যাইত। শিল-নোড়ার আঘাতে শাশুড়ী পুত্রবধূর মৃত্যু ঘটাইয়াছেন এরূপ কাহিনীও আছে। আবার এই সব বধূ বড় হইয়া শ্বশুর শাশুড়ীর উপর অত্যাচার করিতেন এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। একটি কাহিনীতে দেখা যায় চারি পুত্রবধূ মিলিয়া শ্বশুরকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। একটি ধূর্ত পুত্রবধূ শাশুড়ীকে কুম্ভীরপূর্ণ জলাশয়ে পাঠাইয়া তাহার মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। একটি কাহিনীতে আছে যে পিতা মাতার প্রতি স্ত্রীর দুর্ব্যবহারের আশঙ্কায় পুত্র বিবাহই করিলেন না। উৎপীড়িতা শাশুড়ী বা বধূ সংসার ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরূপে জীবন কাটাইয়াছেন থেরীগাথায় এরূপ অনেক কাহিনী আছে। তবে শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি বধূর শ্রদ্ধা ও ভক্তি, এবং বধূর প্রতি শ্বশুর শাশুড়ীর স্নেহের কাহিনীও অনেক আছে।

বালিকা-বধূর সহিত পতির সম্পর্ক ঋগ্বেদের যুগের মত রহিল না। পূর্বেকার পতি-পত্নীর সমকক্ষতার পরিবর্তে এখন পত্নী পতির সম্পূর্ণ অধীন হইল। ধর্মকার্যে পত্নী ছিলেন পতির প্রধান সহায়—এখন ধর্মকার্যে তাহার কোন অধিকারই রহিল না—যিনি ছিলেন গৃহিণী ও সহধর্মিণী, তিনি হইলেন কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' ইহার পরিবর্তে নূতন আদর্শ হইল 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'। সুতরাং ঋগ্বেদের যুগে পত্নীর যে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা ছিল তাহা ধীরে ধীরে লোপ পাইল। বিবাহিত জীবনের প্রকৃতি ও আদর্শ আমূল পরিবর্তিত হইল।

এই পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায় মনুস্মৃতিতে। স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে ইহাই প্রধান ও প্রামাণিক বলিয়া চিরদিন স্বীকৃতি পাইয়াছে। এই বিশাল গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্ত্রীজাতির মর্যাদাসূচক দু' একটি শ্লোক আছে। কিন্তু এই গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের প্রথম কয়টি শ্লোকেই নারী সম্বন্ধে যে সকল উক্তি আছে এবং পরবর্তী স্মৃতিশাস্ত্রে যাহার পুনরুক্তি হইয়াছে—তাহা পাঠ করিলে সে যুগে নারীচরিত্র সম্বন্ধে ধারণা এবং পরিবারে স্ত্রীর স্থান কি ছিল ইহার বেশ স্পষ্ট একটি ছবি পাওয়া যায়। শ্লোক কয়েকটির মর্মার্থ এই :

'দিবানিশি স্ত্রীলোককে পুরুষের অধীনে রাখিতে হইবে। কুমারী অবস্থায় পিতা, বিবাহের পর স্বামী এবং বৃদ্ধবয়সে পুত্রগণ তাহাকে রক্ষা করিবে, কোন অবস্থায়ই স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনভাবে চলা ফিরার অধিকার থাকিবে না (ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি)। স্ত্রীলোক সর্বদাই অসৎ প্রবৃত্তির বশীভূত হয়, সুতরাং ইহার সামান্য মাত্র সূচনা দেখিলেই তাহাকে সতর্ক পাহারা দিবে। ইহারা পর-পুরুষের রূপ বা বয়স বিচার করে না—পুরুষ দেখিলেই তাহার প্রতি আসক্ত হয়। শয্যা, আসন ও অলঙ্কারের প্রতি আসক্তি এবং কাম, ক্রোধ, অসাধুতা, হিংসা এবং কুচর্যা অর্থাৎ কুচরিত্র প্রভৃতি উপাদান দিয়া ভগবান স্ত্রীলোককে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের এই বিধিদত্ত স্বভাব জানিয়া পুরুষ স্ত্রীলোককে খুব হুঁসিয়ার হইয়া পাহারা দিবে। পর-পুরুষ দেখিলেই তাহার সহিত সংভোগ কামনা, অস্থিরমতিত্ব, স্বাভাবিক স্নেহের অভাব প্রভৃতি কারণে পতি বহু আয়াসের সহিত রক্ষা করিলেও স্ত্রী তাহার প্রতি বিমুখ হয়। স্ত্রী যদি জুয়া খেলায় মত্ত বা মাতাল স্বামীর প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখায়, তবে স্বামী তাহার অলঙ্কারাদি রাখিয়া তাহাকে তিন মাসের জন্য পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু স্ত্রীর অনুরূপ দোষ হইলে পতি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিবে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে,

মৃতবৎসা হইলে দশম বর্ষে এবং কেবলমাত্র কন্যা প্রসব করিলে একাদশ বর্ষে তাহাকে ত্যাগ করিবে। পত্নী অপ্রিয়বাদিনী হইলে অর্থাৎ পতির অপ্রিয় কোন কথা বলিলে পতি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ত্যাগ করিবে। কিন্তু এইরূপে পরিত্যক্তা কোন স্ত্রী যদি ক্রোধ সহকারে পতিগৃহ ত্যাগ করে তবে তাহাকে অবরুদ্ধ (টীকাকারের মতে দড়ি দিয়া বান্ধিয়া) রাখিবে, অথবা তাহার পিতামাতার সাক্ষাতে তাহাকে একেবারে ত্যাগ করিবে। পতি যদি স্ত্রীকে এই সমুদয় কারণে পরিত্যাগ করেন অথবা বিক্রয় করেন, তথাপি স্বামীর হাত হইতে তাহার মুক্তি নাই। টীকাকার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে এইরূপ স্ত্রী অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবে না। ক্রেতা যদি এই স্ত্রীলোকের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে তবে সেই পুত্রের উপর পতিরই অধিকার থাকিবে। অন্যত্র (৮-২৯৯-৩০০) বলা হইয়াছে যে "স্ত্রী কোন অপরাধ করিলে তাহাকে দড়ি অথবা বেণুদল অর্থাৎ পাৎলা বাঁশের চটি দিয়া পৃষ্ঠে প্রহার করিবে।"

পতির গৃহে পত্নীর মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার নমুনা পাওয়া গেল। অতঃপর পতির প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে যে সমুদয় আদেশ বা নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি ঃ "স্ত্রী পতির জীবিতকালে তাঁহার পরিচর্যা (আজ্ঞা পালন) করিবে, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতির প্রতি অক্ষুণ্ণ ও অবিচলিত শ্রদ্ধা পোষণ করিবে। পতি যদি অসৎ, অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত এবং সর্বগুণহীন হয় তথাপি পতিকে সর্বদা দেবতার ন্যায় পূজা করিবে। পতির পরিচর্যা করিলেই পত্নীর স্বর্গ লাভ হইবে। যে সতী সাধ্বী স্ত্রী স্বর্গ কামনা করে সে, পতি জীবিতই হউক বা মৃতই হউক, কখনও তাহার অপ্রিয় কোন কার্য করিবে না। যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে পতির অনুগত হয় তাহাকেই লোকে সাধ্বী বলে এবং সে মৃত্যুর পর পতিসহ স্বর্গবাস

করে। পতির প্রতি অবিশ্বাসিনী হইলে স্ত্রী ইহলোকে নিন্দিতা হয় এবং পরজন্মে শৃগাল হয়।"

মনু একস্থলে (৯-১০১, ১০২) নির্দেশ দিয়াছেন যে পতি পত্নী যেন আমরণ পরস্পরের প্রতি অব্যভিচারী হয়। কিন্তু এই মহান আদর্শ কার্যতঃ স্ত্রীর পক্ষেই প্রয়োগ করিয়াছেন, স্বামীর পক্ষে নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনুর দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। 'স্ত্রী মৃত পতির স্মৃতির প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা না করিয়া তপস্বিনীর ন্যায় ফলমূল ভোজন করিয়া জীবনযাপন করিবে এবং পরপুরুষের নাম পর্যন্ত মুখে আনিবে না (৫-১৫৭)। কিন্তু পত্নীর মৃত্যু হইলে পতি পত্নীকে দাহ করিবার পর পুনরায় বিবাহ করিবে (৫-১৬৭)।' ইহার কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—"কিন্তু গৃহধর্ম

স্ত্রী না হলে অপূর্ণ যে রয়,
মনু হতে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়।"

রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্কৃতি' নামক কবিতায় মঞ্জুলিকার পিতার চরিত্র যে মনুসংহিতা অনুসারে আদর্শ পতির চিত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মনুর আদর্শই দুই সহস্র বৎসর পর্যন্ত হিন্দু সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই অনুদার আদর্শ গৃহীত হইলেও অনেক পতি বা পত্নী ইহা অনুসরণ করেন নাই। কারণ মনুর বিধান অপেক্ষা মনুষ্যত্বের বিধান যে অনেক বড়, এই সত্য স্বীকার করিয়া তদনুসারে জীবন যাপন করার মত লোকের অভাব সম্ভবতঃ কখনও হয় নাই। কিন্তু এইরূপ ব্যতিক্রম থাকিলেও মনুস্মৃতির যুগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত হিন্দু সমাজে স্ত্রীজাতির জীবনযাত্রা যে সাধারণভাবে মনুস্মৃতির বিধান দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা কঠিন। বিংশ শতাব্দীতেও অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি মনুর আদর্শকেই স্ত্রীজাতির পক্ষে কল্যাণকর ও মহান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তবে মনুর আদর্শ যে সহজে বা খুব শীঘ্র হিন্দু সমাজে স্বীকৃত হয় নাই তাহারও প্রমাণ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্ত্রীর অনেক বেশী মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। স্ত্রী সর্ব অবস্থায়ই স্বামীর নিকট গ্রাসাচ্ছাদন দাবি করিতে পারিত এবং স্ত্রী বা স্বামী কেহই একে অন্যের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে পারিত না। বৌদ্ধ সাহিত্যেও বিবাহ বিচ্ছেদের একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। ইসিদাসী নামক ভিক্ষুণী গার্হস্থ্য জীবনে দুইবার স্বামীপরিত্যক্তা হইয়া আবার বিবাহ করেন এবং তৃতীয়বার পরিত্যক্তা হইলে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী-সংঘে প্রবেশ করেন। মনুর বিধান সত্ত্বেও যে অনেক স্ত্রীলোকের ঋতুমতী হইবার পর বিবাহ হইত এবং তাহারা যে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। অনেক নারী দেশ-শাসন কার্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। সাতবাহন বংশের রাণী নয়নিকা, বাকাটক বংশের রাণী প্রভাবতী, চালুক্য বংশের বিজয়ভট্টারিকা এবং কাশ্মীরের সুগন্ধা, দিদ্দা ও সূর্যমতী, এবং উড়িষ্যায় কর বংশের ত্রিভুবন মহাদেবী নামক দুইজন, ধর্মমহাদেবী, বকুল মহাদেবী ও দণ্ডী মহাদেবী মোট এই পাঁচজন রাণী রাজত্ব করেন। এই কর বংশের এক প্রাচীন রাণী দেবী গোস্বামিনী এই রাজ্য এক বিষম বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতে চাহমান ও গাহড়বাল বংশীয়া রাণীরা এবং দাক্ষিণাত্যে চালুক্য রাজ্যে চারিজন সম্রাজ্ঞী ও দুইজন সম্রাট-কন্যা বিস্তৃত ভূভাগের শাসন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। স্ত্রীলোক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্রী এবং নানা উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত প্রাচীন তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীতে সিল্লা (৮-১০৬৯) ও চুড্ডা (৮-১১৩০,১১৩৭) নামে দুইজন বীরাঙ্গনার উল্লেখ আছে। ইহারা এবং গুজরাটের চৌলুক্য বংশের শিশু রাজা দ্বিতীয় মূলরাজের মাতা নাইকি পুত্রকে কোলে লইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্য চালনা করিয়া শত্রুকে

পরাভূত করিয়াছিলেন। সুতরাং মনুসংহিতার আদর্শ পুরাপুরি কখনও গৃহীত হয় নাই।

স্ত্রীজাতির সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার পর তাহাদের জীবনের কয়েকটি বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, বিধবা-বিবাহ। বৈদিক যুগে বিধবার বিবাহ প্রচলিত ছিল। এমন কি পতি বহুদিন অনুপস্থিত থাকিলে পত্নী পুনরায় বিবাহ করিতে পারিত, ধর্মসূত্রে এরূপ বিধান আছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিধবা-বিবাহ প্রথমে অবাঞ্ছনীয় ও পরে নিষিদ্ধ হয়। মনুস্মৃতিতে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তীকালে রচিত নারদ (১২-৯৭) ও পরাশর স্মৃতির (৪-২৮) নিম্নলিখিত শ্লোকে বিধবা বিবাহের সমর্থন আছে।

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

অর্থাৎ পতি যদি নষ্ট (নিখোঁজ), মৃত, সন্ন্যাসী, ক্লীব বা পতিত হয় তবে স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে।

বিধবা বিবাহের বিকল্প ছিল নিয়োগ প্রথা অর্থাৎ দেবর বা অন্যপুরুষের দ্বারা গর্ভাধান। প্রথমে ইহা খুব প্রচলিত ছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে একেবারে নিষিদ্ধ হয়। মনুস্মৃতিতে প্রথমে নিয়োগ প্রথার সমর্থন আছে (৯-৫৯,৬০), কিন্তু অব্যবহিত পরেই ইহাকে নিন্দনীয় বলা হইয়াছে এবং নিষেধ করা হইয়াছে (৯-৬৪)।

বিধবা বিবাহ নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত অন্য যে সমুদয় কারণে স্ত্রীলোক দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে পারিত তাহাও নিষিদ্ধ হইল। অপর পক্ষে পুরুষের বহু বিবাহ এবং মৃত পতির সঙ্গে জীবন্ত পত্নীর চিতারোহণ অর্থাৎ সতী প্রথাও বৃদ্ধি পাইল। চেদীরাজ গাঙ্গেয়দেবের মৃত্যু হইলে (১০৪০ খৃঃ) তাঁহার একশত রাণী তাঁহার

সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। বহুবিবাহ ও সতী-প্রথার ইহা একটি উৎকট দৃষ্টান্ত।

বাল্যবিবাহ, বেদাদি শাস্ত্রপাঠ নিষেধ, উচ্চ শিক্ষার অভাব, বৈদিক ধর্মকার্য ও উপনয়নাদি বৈদিক ধর্মসংস্কার নিষেধ, পতির বহুবিবাহ, স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় পতি গ্রহণ নিষেধ, সতীপ্রথা প্রভৃতি স্ত্রীলোকের অবস্থার অবনতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

সর্বপ্রকারে স্ত্রীলোকের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইলেও দুই একটি বিষয়ে তাহাদের অবস্থা আধুনিক যুগের তুলনায়ও উন্নত ছিল। স্ত্রীলোক আইনের চক্ষে অবধ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। কোন কোন স্মৃতি অনুসারে কেহ নারীর উপর বলাৎকার করিলে এমন কি নারী পর পুরুষের সহিত স্বেচ্ছায় সহবাস করিলেও, সাধারণতঃ গৃহ হইতে বিতাড়িত অথবা সমাজে পতিত হইত না। তাহার অন্যপ্রকার দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল। রাস্তায় ভীড় হইলে যে কয়েক শ্রেণীর লোককে অগ্রে যাইবার অধিকার দেওয়া হইত স্ত্রীলোক তাহাদের অন্যতম। পতিতের পুত্র পতিত হইলেও কন্যা পতিতা হইত না। স্ত্রীলোককে কর দিতে হইত না এবং একই অপরাধের জন্য পুরুষের অর্ধেক প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। বিচারালয়ে তাহাদের কয়েকটি বিশিষ্ট সুবিধা ছিল।

স্ত্রীলোকের অবরোধ বা পর্দা-প্রথা সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিশিষ্ট মর্যাদা বলিয়া ধীরে ধীরে পরিগণিত হইতেছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত বা নিম্নশ্রেণীর পরিবারের স্ত্রীলোকদের মধ্যে ইহা হিন্দুযুগে প্রচলিত ছিল এরূপ কোন প্রমাণ নাই।

সমাজে পুরুষের ন্যায় নারীরও প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা অনেকটা তাহার আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। পতিপুত্র ভরণপোষণ করিলেও সেই কারণেই যে তাহাদের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে এবং স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সেই অনুপাতে খর্ব হয়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পতিপুত্রহীনা স্ত্রীলোক হিন্দু

পরিবারের ও সমাজেরই একটি বিশিষ্ট অংশ। তাহাদের জীবিকার্জনের সামর্থ্যের উপরই তাহাদের এবং ক্রমশঃ নারীজাতির প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা গড়িয়া ওঠে। বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে অসহায়া বিধবাদের দুরবস্থা ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুতরাং কোন সমাজে নারীর অবস্থা জানিতে হইলে অর্থনীতির দিক দিয়াও ইহার আলোচনা আবশ্যক। পুরুষের ন্যায় কায়িক শক্তির অভাবে স্ত্রীলোকের জীবিকার্জনের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। প্রাচীন সাহিত্য হইতে দেখা যায় যে উচ্চশ্রেণীর বৃত্তির মধ্যে শিক্ষকতা ও কিয়ৎপরিমাণে চিকিৎসা স্ত্রীলোকেরা করিত। কিন্তু স্ত্রীলোকের সবচেয়ে বড় বৃত্তি ছিল সূতা কাটা ও কাপড় জামা প্রভৃতি বোনা। যাহাতে গৃহস্থ বধূরা মর্যাদা বা সম্মান হানি না করিয়া ইহাদ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে পারে রাজা তাহার ব্যবস্থা করিতেন—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইহার বিস্তৃত বিবরণী পাওয়া যায়। বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে একাধিক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে স্ত্রী মরণোন্মুখ স্বামীকে সান্ত্বনা দিতেছে যে তিনি যেন পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুর্ভাবনা না করেন, কারণ কার্পাস ও পশমের বস্ত্র বয়ন করিয়াই তিনি নিজেই সংসার চালাইতে পারিবেন।

কোন সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থা বিচারের একটি মানদণ্ড—দেশের উত্তরাধিকার আইনে তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা। নিজের স্ত্রীধন ও স্বামীর সম্পত্তি হইতে আজীবন ভরণপোষণের দাবি স্ত্রীলোক মাত্রেরই ছিল। স্বামী অপুত্রক হইলে স্ত্রী তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী কিনা এ সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রে মতভেদ আছে। গৌতম-ধর্মসূত্র (২৮-২০) ইহার সমর্থন করে, কিন্তু আপস্তম্ব-ধর্মসূত্র, মনুস্মৃতি, এবং নারদস্মৃতি ইহার বিরোধী। যাজ্ঞবল্ক্য (২-১৩৫), বিষ্ণু ও কাত্যায়ন-স্মৃতি অনুসারে অপুত্রক স্বামীর ধনে বিধবারই সর্বপ্রথম অধিকার। বঙ্গদেশে জীমূতবাহনের দায়ভাগে (১১০০-১১৩০ খৃঃ) এবং তাহার

পূর্বেও এই অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানেশ্বর (১০৮০-১১০০ খৃঃ), অপরার্কের টীকা (১১০০-১১৩০ খৃঃ), এবং স্মৃতিচন্দ্রিকাও (১২০০-১২২৫ খৃঃ) এই মতের এবং বিধবার অভাবে কন্যার উত্তরাধিকার সমর্থন করে। সুতরাং উত্তরাধিকার বিষয়ে স্ত্রীলোকের অবস্থার ক্রমিক উন্নতি দেখা যায়। তবে সাধারণতঃ স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার কেবলমাত্র জীবনস্বত্ব ছিল—দান বা বিক্রয়ের ক্ষমতা ছিল না ॥

পাদটীকা

১। Schmidt, *Beitrage Zur Indischen Erotik*, 3rd Edition, Berlin, 1922, p. 9.
২। A. B. Keith, *A History of Sanskrit Literature*, p. 469.
৩। A. S. Altekar, *The Position of Women in Hindu Civilization*, p. 21.

চতুর্থ বক্তৃতা

মধ্যযুগে বঙ্গনারী

মধ্যযুগে অর্থাৎ মোটামুটি ১২০০ হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্ত্রীলোকদের অবস্থা অবনতির চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল। ইহার যে কয়টি প্রধান লক্ষণ সে সম্বন্ধে প্রথমে কিছু আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ, বাল্যবিবাহ—ধর্মসূত্রে, স্মৃতিতে ও মহাভারতে বাল্য-বিবাহের বিধি থাকিলেও ইহার ব্যতিক্রমের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মহাভারতে কোন বালিকার বিবাহের উল্লেখ নাই—যে সকল মহিলার উল্লেখ আছে তাহারা প্রত্যেকেই পূর্ণ যুবতী অবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন।[১] ইতিহাসে একাধিক স্বয়ম্বরের কাহিনী আছে তাহাও বাল্য-বিবাহের বিরোধী। কিন্তু মধ্যযুগে অন্ততঃ বাংলাদেশে বাল্য-বিবাহপ্রথা কঠোর ভাবে প্রতিপালিত হইত। এ যুগের প্রধান স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ষোড়শ শতাব্দীর লোক। তাঁহার ব্যবস্থাই বঙ্গ-দেশে বেদবাক্যের ন্যায় গৃহীত হইত। তিনি উদ্বাহতত্ত্বে লিখিয়াছেন: "কন্যার রজোদর্শন হইবার পূর্বেই কন্যাদান প্রশস্ত। ৮ বৎসরের কন্যাকে গৌরী বলে, ৯ বৎসরের কন্যা রোহিণী, ১০ বৎসরে কন্যকা এবং ইহার পর রজঃস্বলা হয়। অতএব দশ বৎসরের মধ্যে যত্নসহকারে কন্যাকে প্রদান করা কর্তব্য।...যে কন্যা ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত অপ্রদত্তা হইয়া পিতৃগৃহে বাস করে তাহার পিতা 'ব্রহ্মহত্যা' পাপের ভাগী হয়; এরূপ স্থলে ঐ কন্যার স্বয়ং বর অন্বেষণ করিয়া বিবাহ করা উচিত।"[২] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে রঘু-নন্দনের বিধি অনুসারে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অবশ্য রঘুনন্দন প্রাচীন শাস্ত্রকারদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই বিধি দিয়াছিলেন—কিন্তু মধ্যযুগের অন্ধ সংস্কার এই

মতটিকে ধর্মের অঙ্গরূপে গণ্য করিয়া বিনা বিচারে ইহা পালন করিত এবং গৌরীদান করিয়া ঐ কন্যার গর্ভজাত সন্তানের পিতৃকুলে একুশ পুরুষ এবং মাতৃকুলে ছয় পুরুষের অক্ষয় স্বর্গবাসের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিত।[৩]

বাল্যবিবাহের ন্যায় বহুবিবাহও যে প্রাচীন হিন্দুযুগে প্রচলিত ছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু মধ্যযুগে বাংলা দেশে কৌলীন্য প্রথার ফলে যে বীভৎস অবস্থার সৃষ্টি হয় পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলে না। সেইজন্য ইহার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বা তাহার কিছু পরে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে কয়েকটি ব্যক্তিকে গুণানুসারে উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত করা হয়—ইহাদের সাধারণ সংজ্ঞা হয় কুলীন। বঙ্গদেশে প্রবাদ এই যে সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেন দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে এই কৌলীন্য মর্যাদার প্রবর্তন করেন। বাচস্পতি মিশ্র বলেন যে রাজা বল্লাল সেন নিম্নোক্ত নয়টি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে কুলীনের মর্যাদা দেন—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ, দান। এই নয়টি গুণ যাঁহাদের ছিল তাঁহারা কুলীন হইলেন, আর যাঁহাদের ইহার মধ্যে আটটি, সাতটি অথবা তাহা অপেক্ষাও অল্পসংখ্যক গুণ ছিল তাঁহারা যথাক্রমে সিদ্ধ শ্রোত্রিয়, সাধ্য শ্রোত্রিয় ও কষ্ট শ্রোত্রিয় নামে অভিহিত হইলেন। বিভিন্ন কুলজীর মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে কুলীনের মর্যাদা ব্যক্তিগত ছিল, উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্র পিতার কৌলীন্য দাবি করিতে পারিবে না, এবং প্রথমে বল্লাল যেন যাঁহাদের কুলীনের মর্যাদা দেন তাঁহাদের সংখ্যা কুড়ির বেশী ছিল না। সমস্ত কুলীনই এক পর্যায়ভুক্ত হইলেন এবং অকুলীনের কন্যা বিবাহ করিতেও তাহাদের কোন বাধা ছিল না। বল্লাল সেনের পুত্র

লক্ষ্মণ সেনের সময় একটি গুরুতর পরিবর্তন হইল। প্রথম প্রথম গুণানুসারে মাঝে মাঝে নূতন নূতন ব্যক্তিকে কুলীনের মর্যাদা দেওয়া হইত। লক্ষ্মণ সেন কুলীনের বৈবাহিক সম্বন্ধের বিষয়ে অনেক নিয়ম করিলেন এবং এই নিয়ম কাহারা কতদূর অনুসরণ করিয়াছে তাহার বিচার করিয়া কুলীনদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করিলেন। কিছুকাল পরে পরে এই শ্রেণী বিভাগ নূতন করিয়া করা হইত, ইহার নাম সমীকরণ। লক্ষ্মণ সেনের সময় এইরূপ দুইটি সমীকরণ হয়। ধ্রুবানন্দ মিশ্র সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বর্তমান ছিলেন—তাঁহার কুলজী গ্রন্থে এইরূপ ১১৭টি সমীকরণের উল্লেখ আছে। এই সময়ের পূর্বেই কৌলীন্য মর্যাদা ব্যক্তিগত গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া পৈতৃক বংশগত মর্যাদায় পরিণত হইয়াছিল। বলাবাহুল্য ইহাদের মধ্যে অনেকেরই পূর্বোক্ত নবগুণ তো দূরের কথা তাহার একটিও ছিল কিনা সন্দেহ। বরং ক্রমে ক্রমে কুলীনদের মধ্যে নানা দোষ ঘটিতে লাগিল। ইহার ফলে দেবীবর ঘটক কুলীনদের দোষ অনুসারে তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ে ভাগ করেন। অর্থাৎ যাহারা একই প্রকার দোষে দোষী তাহাদের লইয়া এক একটি ভিন্ন সম্প্রদায় হইল। এই সব সম্প্রদায়ের নাম হইল মেল—সম্ভবতঃ মেলন শব্দের অপভ্রংশ। দেবীবর কুলীনদিগকে এইরূপ ৬৬ মেলে বিভক্ত করেন। স্থির হয় যে প্রত্যেক কুলীনকেই নিজ নিজ মেলের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। এক একটি মেলের মধ্যে লোকসংখ্যা কম হওয়ায় ইহার ফল হইল বিষময়। একদিকে, উপযুক্ত পাত্র মিলিত না সুতরাং কন্যাকে আজীবন কুমারী থাকিতে হইত। অন্য দিকে, পুরুষ একাধিক বিবাহ করিত। বহু কুমারীর বিবাহ হইত না। যাহাদের বিবাহ হইত তাহারা প্রায় সারা জীবন পিতৃগৃহেই থাকিত, স্বামীর সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হইত। কারণ অনেক কুলীনের ৫০, ৬০, বা তাহারও অধিক স্ত্রী থাকিত।[৩ক] সুতরাং

ইহার মধ্যে মাত্র কয়েকজন তাহার গৃহে স্থান পাইত। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের পেশাই ছিল বিবাহ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। তাঁহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিবাহ করিতেন—প্রতি বিবাহের ফলেই কিছু অর্থ মিলিত। কখনও কখনও একই পরিবারের একাধিক অনূঢ়া কন্যা এক সঙ্গে একই বরের হস্তে সম্প্রদান করা হইত। এরূপ অনেক ঘটনা শোনা যায় যে এক মুমূর্ষু কুলীনের সঙ্গে দিদি, পিসী, ভাইঝি প্রভৃতি সম্পর্কের একই পরিবারস্থ ১০।১২টি কন্যার একসঙ্গে বিবাহ হইয়াছে—এবং ১০ হইতে ৫০ বা তদূর্ধ্ব বয়সের এই সকল স্ত্রী কয়েক দিনের মধ্যেই এক সঙ্গে বিধবা হইয়াছে। তখনকার দিনে বিশ্বাস ছিল যে অনূঢ়া স্ত্রীলোক মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাইতে পারিত না। সুতরাং মৃত্যুপথযাত্রীর সঙ্গে একদল বালিকা-যুবতী-বৃদ্ধার বিবাহ দিয়া তাহাদের কুমারীত্ব ঘুচাইয়া স্বর্গের পথ মুক্ত করা হইত। কুলীনদের বিবাহের সংখ্যা প্রায়ই এত অধিক হইত যে একটি খাতাতে বিবাহিতা স্ত্রীগণের নাম পরিচয় লিখিয়া রাখিতেন—প্রয়োজন বোধ করিলে এবং সময় পাইলে খাতা দেখিয়া শ্বশুর বাড়ী 'যাইতেন—কারণ ইহাতে বেশ কিছু অর্থোপার্জন হইত। কুলীন জামাতা শ্বশুরবাড়ী গেলে তাঁহার মর্যাদার জন্য নানা উপলক্ষে টাকা দিতে হইত। একটি ছিল শয্যা-গ্রহণী—অর্থাৎ টাকা না দিলে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করিবেন না, ইত্যাদি। এইসমুদয় কাহিনী বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু ইহা যে অমূলক নহে সে বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। যে গ্রামে আমার জন্ম সেখানে এক বাড়ীতে দুই কুলীন ভাই ছিলেন। বাল্যকালে তাহাদের একজনের ছেলে গ্রামের বিদ্যালয়ে আমার সঙ্গে পড়িত এবং আমি তাহাদের বাড়ী যাইতাম। এইরূপে তাহাদের অনেক খবর শুনিয়াছিলাম। দুই ভাইর প্রত্যেকেরই ৫০।৬০টি করিয়া স্ত্রী ছিল। কয়েকটি তাঁহাদের সঙ্গে থাকিত—সম্ভবতঃ, পালাক্রমে নূতন নূতন বধূর দল আসিত যাইত—কারণ

আমার বেশ মনে আছে, গ্রামের নাম ধরিয়া তাহাদের ডাকা হইত—অমুক গ্রামের বউ, অমুক গ্রামের মা, খুড়ী, জেঠী ইত্যাদি সম্বোধন ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। তখনকার দিনে গল্প শুনিতাম যে কুলীন ব্রাহ্মণ স্ত্রীর পিত্রালয়ে কোন গ্রামে যাইয়া শ্বশুর বাড়ী চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু খাতায় শ্বশুরের নাম লেখা ছিল—তাহার নাম করিয়া নদীর ঘাটে একটি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা অমুকের বাড়ীটা কোন দিকে'। পরে জানিতে পারিলেন ঐ মহিলাই তাঁহার স্ত্রী। এই ঘটনা সত্য কিনা জানি না, কিন্তু অনুরূপ ঘটনা আমি নিজে বাল্যকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের গ্রামে একটি ডাকঘর ছিল—সকালে চিঠি আনিবার জন্য অনেকেই সেখানে একত্র হইতেন। একদিন আমিও উপস্থিত ছিলাম। একটি অপরিচিত যুবক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী কোন পথে যাইব? প্রশ্নের উত্তরে জানাইল শ্যামাচরণ তাঁহার পিতা। শ্যামাচরণ ঐখানেই উপস্থিত ছিলেন—তিনি যুবকের মাতামহের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের পিতৃত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া গেলেন। ঘটনাটি আমার নিকট এত অদ্ভুত মনে হইয়াছিল যে ৭০ বৎসর পরে আজও মনে আছে। যতদূর মনে পড়ে সেখানে উপস্থিত বৃদ্ধের দল কিঞ্চিৎ হাস্যকৌতুক করিলেও বিশেষ আশ্চর্য বোধ করিলেন না। ইহাতে মনে হয় তাঁহাদের কাছে এরূপ ব্যাপার খুব নূতন বা অদ্ভুত মনে হয় নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে নিজের এই অভিজ্ঞতায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে প্রথাবদ্ধভাবে পবিত্র বিবাহপদ্ধতির এরূপ অবমাননা এবং স্ত্রীর প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধার চিত্র বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায় না। নানা দেশের ইতিহাস পড়িয়াও আজ পর্যন্ত আমার মনে সেই ধারণাই আছে। এইরূপ প্রথার অবশ্যম্ভাবী ফলে কুলীন ব্রাহ্মণের পরিবার নানারূপ ব্যভিচারের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—এবং হিন্দু সমাজ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও

যে শতাব্দীর পর শতাব্দী এই অবস্থা মানিয়া চলিয়াছিল, ইহা হিন্দুর অধঃপতনের একটি চরম নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

স্ত্রীজাতির অমর্যাদা ও হিন্দু সমাজের নৃশংসতার তৃতীয় নিদর্শন সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা। প্রাচীন বৈদিক যুগে ইহার প্রচলন ছিল না, কিন্তু পরবর্তী স্মৃতির যুগে ইহা অনুষ্ঠিত হইত, ইহা পূর্বের বক্তৃতায় বলিয়াছি। কিন্তু খুব সম্ভবতঃ তখন ইহা রাজপরিবার এবং সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং ইহার সংখ্যাও কমই ছিল। প্রামাণিক স্মৃতিগ্রন্থেও ইহার অনুমোদন নাই। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রে বিধবা কিভাবে জীবনযাপন করিবে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে কিন্তু সহমরণের কথা নাই। পরবর্তী কতকগুলি অর্বাচীন স্মৃতি শাস্ত্রে ইহার ভূয়সী প্রশংসা আছে। শঙ্খ ও আঙ্গিরস স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে মানুষের গায়ে যত লোম আছে তত অর্থাৎ সাড়ে তিনকোটি পরিমিত বৎসর কাল সহমৃতা স্ত্রী স্বর্গে বাস করিবে এবং অপ্সরাগণের স্তুতি লাভ ও স্বামীর সঙ্গে অনন্তকাল ক্রীড়ার আনন্দ লাভ করিবে। স্বামী যদি ব্রহ্মঘ্ন, কৃতঘ্ন, মিত্রঘ্ন বা সুরাপায়ী হন তথাপি স্ত্রী সহমৃতা হইলে তাঁহার সর্বপাপ বিনষ্ট হইবে। বৃদ্ধহারীতের মতে স্ত্রী সহমৃতা হইলে তাহার পতি, পিতা ও মাতার কুল পবিত্র হয়। সাধ্বী নারীর সহমরণ ভিন্ন অন্য গতি নাই।

ধর্মশাস্ত্রের এই সকল উক্তিই যে সহমরণের জনপ্রিয়তার মূলে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই অনন্ত পুণ্যের আশ্বাসে বহু স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতেন—বহু অনুরোধ উপরোধেও সংকল্প হইতে নিবৃত্ত হইতেন না এবং জীবন্তে অগ্নিদগ্ধ হইবার সময়ও কোন যন্ত্রণা অনুভব বা কাতরতা প্রকাশ করিতেন না—বহু প্রত্যক্ষদর্শী ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।[৪] আমার পিতার পিতামহী সহমৃতা হইয়াছিলেন। আমার এক জেঠীমা

তখন নববধূরূপে আমাদের সংসারে আসিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধকালে তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে যখন পুলিশের দারোগা আসিয়া আমার প্রপিতামহীকে নানা প্রকারে নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন তখন আঙ্গুলে ঘৃতসিক্ত কাপড় জড়াইয়া প্রদীপ শিখায় তাহা পোড়াইতে লাগিলেন—বিন্দুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, মৃত্যু প্রেমের কষ্টিপাথর—তুমি দেশকে ভালবাস কিনা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তুমি দেশের জন্য মরিতে পার কিনা। এই প্রসঙ্গে তিনি সতী স্ত্রীর সহমরণের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন: "বস্তুতঃ দল বাঁধিয়া মরা সহজ। একাকিনী চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার মত বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে বিরল। বাংলার সেই প্রাণ-বিসর্জন-পরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি।"[৫] ইহা হইতে মনে হয় যে সহমরণকে তিনি পতিপ্রেমেব চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই যে আত্মবিসর্জন ইহা কি পতিপ্রেম অথবা শাস্ত্রীয় অনুশাসন মতে অনন্ত স্বর্গবাসের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রণোদিত, ইহা বলা কঠিন। যে কারণে লোকে নিজের সন্তানকে গঙ্গাজলে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হইত না এবং কঠোর দৈহিক পীড়ন সহ্য করিয়া যোগ বা তপস্যা দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিতে আগ্রহশীল হইত, সহমরণও প্রধানতঃ সেইরূপ অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসের ফল মাত্র, পতির প্রতি গভীর প্রেমজনিত নহে—এরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে কারণ যাহাই হউক এই সব সতী যে মনের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহারা সহমরণের অনুমোদক ও সমর্থক তাহারা অনেক সময় যে হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছে তাহাতেও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই যে সহমৃতা হইতে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে নানারূপে প্রলুব্ধ, এবং পাছে শেষ মুহূর্তে তাহার মতি পরিবর্তিত হয় এই জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হইত। উনবিংশ

শতাব্দীর প্রথম ভাগেও যে কিরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত এই কার্য সম্পন্ন হইত, একজন প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদপত্রে তাহার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি : "নরবলি, গঙ্গাজলে মনুষ্যবালক জীবদ্দান করণ ও রথের চাকার নীচে গাত্র ঢালন পূর্বে ছিল তাহা হইতে ভয়ানক সহমরণ অনুমরণ ভদ্রলোকের দর্শনে বোধ হয়। কারণ অবলা অনভিজ্ঞা স্ত্রীলোককে শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা ভ্রম জন্মাইয়া এরূপ উৎকট কর্মে প্রবৃত্ত করাণ, সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় হস্তধারণপূর্বক ঘূর্ণপাকে সাতবার ঘুরাইয়া শীঘ্র চিতারোহণ করাইয়া শবের সহিত দৃঢ় বন্ধন পুরঃস্বরে জলদগ্নিতে দগ্ধ করণ ও বংশদ্বয় দ্বারা শবের সহিত তাহার শরীর দাবিয়া রাখন ও তাহার কথা কেহ শুনিতে না পায় এ নিমিত্তে গোলমালধ্বনি করণ অতি দুরাচার নির্মায়িক মনুষ্যের কর্ম এমত বিষয়ে তাহার সাহায্যকারি ও সঙ্গি লোক সকলেই দোষী হইতেছেন। শাস্ত্রের ভাল মন্দ পরমেশ্বর জানেন আপাতত শাস্ত্র দেখাইয়া এমত কর্মে প্রবৃত্ত হওন কিংবা করাণ বিশিষ্ট লোকের অনুচিত ইতি।"[৬]

শাস্ত্রে অন্ধবিশ্বাস ছাড়াও বিধবা-জীবনের দুঃখ দুর্দশাও যে অনেক সদ্য বিধবাকে সহমরণে অনুপ্রাণিত করিত ইহা অসম্ভব নহে। বাংলা দেশে বিধবাদের অশন বসনের কষ্টতো ছিলই, অধিকাংশেরই পর-মুখাপেক্ষী হইয়া এবং প্রায় দাসীবৃত্তি করিয়া জীবনধারণ করিতে হইত। তাহাদের কোনরূপ স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য ছিল না। সমাজে, এমন কি নিজ পরিবারেও তাহারা অশুভের মূর্তি বলিয়া বিবেচিত হইত —কোন মাঙ্গলিক কার্যে যোগদান, এমন কি উপস্থিত থাকাও তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। একদিকে এই ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্র, অন্যদিকে সহমৃতা হইলে ইহলোকে দুঃখ কষ্টের হাত হইতে মুক্তি এবং পর-লোকে পতিসহ অনন্ত স্বর্গসুখভোগ—শাস্ত্রের এই প্রলোভন। এ অবস্থায় যে যুগে পতি শুধু পরমগুরুই নহে, দেবতার ন্যায় পূজ্য বলিয়াও বিবেচিত হইতেন, সে যুগে যে স্ত্রীলোকেরা শাস্ত্রের উক্তিতে

অন্ধবিশ্বাসী হইয়া আত্মহত্যা করিবেন—ইহা খুব আশ্চর্যের কথা নহে।

মহামহোপাধ্যায় কানে বলেন যে বাংলাদেশে সহমরণের আধিক্যের কারণ এই যে দায়ভাগের বিধান অনুসারে অপুত্রক স্বামীর মৃত্যু হইলে যৌথ পরিবারে উক্ত স্বামীর যাহা কিছু অধিকার সমস্তই তাহার স্ত্রীতে বর্তাইত—অন্য সব প্রদেশের স্ত্রীরা কেবলমাত্র ভরণপোষণের অধিকার পাইত। এইজন্যই বঙ্গদেশের যৌথ পরিবারের অন্য সব অংশীদারেরা উক্ত স্ত্রীর অংশ পাইবার জন্য তাহাকে শাস্ত্রে পাতিব্রত্যের দোহাই ও স্বর্গের প্রলোভন প্রভৃতি দেখাইয়া সহমরণে উৎসাহিত করিত।[৭] কোন কোন স্থানে এই অনুমান সত্য হইলেও ইহা সহমরণের একটি সাধারণ কারণ বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। কারণ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে সহমরণের সংখ্যাধিক্য হইলেও পূর্বকালে ভারতের অন্য-প্রদেশেও ইহার বহুল প্রচলন ছিল—এবং যে সমুদয় রাজ পরিবারে বা অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারে ইহার বেশী প্রচলন ছিল সেখানে সম্পত্তি অধিকারের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। মধ্যযুগে বাংলার বাহিরেও যে সহমরণ-প্রথা খুব প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ আছে। নিকোলো কন্টি নামে একজন ইতালীয় পর্যটক বিজয়নগরের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (১৪২০-২১ খ্রীঃ): "এ দেশের লোকেরা যতবার খুশী বিবাহ করে এবং তাহাদের স্ত্রীরা মৃত পতির চিতায় পুড়িয়া মরে। এই দেশের রাজার প্রায় ১২,০০০ রাণী আছে, ইহার মধ্যে দুই তিন হাজারের এই শর্তে বিবাহ হয় যে রাজার মৃত্যু হইলে তাহারা স্বেচ্ছায় তাহার সহিত পুড়িয়া মরিবে।" আরও বহু বিদেশীয় পর্যটক ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সহমরণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হ্যামিল্টন বুকানান (১৭৬২-১৮২৯) শাহাবাদ জেলায় এবং রালফ্

ফিচ (১৫৮৩-৯১) আহমদনগর, বুরহানপুর ও বারাণসীতে সহ-মরণের কথা লিখিয়াছেন। মোগল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। উইলিয়ম হকিন্‌স্ (১৬০৮-১৩) লিখিয়াছেন যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশ ছিল তাঁহার অনুমতি ব্যতীত এবং তাঁহার কাছে উপস্থিত না করাইয়া আগ্রার কোন স্ত্রীলোককে সহমরণের অনুমতি দেওয়া হইবে না। বহু দরিদ্র স্ত্রীলোককে আমি সম্রাটের নিকট আসিতে দেখিয়াছি। এরূপ কোন স্ত্রীলোক আসিলে তিনি তাহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ ও জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করিবেন এইরূপ আশ্বাস দিয়া সহমরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু আমি যতদিন- ছিলাম কাহাকেও প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখি নাই। ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ের লিখিয়াছেন (১৬৫৬-৮) যে "মুসলমান-শাসিত রাজ্যে সতীদাহের সংখ্যা কম, কারণ প্রাদেশিক শাসনকর্তার অনুমতি ব্যতীত কোন স্ত্রীলোক সহমরণে যাইতে পারে না। ...কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সহমরণের সংখ্যা খুবই বেশী, বিশেষতঃ হিন্দু রাজ্যে"[৮]। কিন্তু ইঁহারা সকলেই বলেন যে কোন কোন স্থানে বল প্রয়োগ হইলেও সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দে এই নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করিত।[৮ক] রাণী অহল্যা বাঈর একমাত্র কন্যার সহমরণের যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় তাহাও ইহার সমর্থন করে। সহমরণের কালে শত শত সধবা রমণী সতীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে শ্মশানে সমবেত হইত, তাহার পদধূলি গ্রহণ করিত এবং পায়ের আলতার ছাপ সযত্নে রক্ষা করিত। সতীর কীর্তি ও স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য স্তম্ভ বা মন্দির নির্মিত হইত। সাধারণ হিন্দুর চক্ষে সতীর এই মহিমার নিদর্শনও হয়ত অনেককে সহমরণে প্রবৃত্ত করিত। মোগল বাদ-শাহেরা এবং তাঁহাদের শাসনকর্তারা সতীপ্রথা বন্ধ করিতে

চেষ্টা করেন—কাশ্মীরের মুসলমান সুলতান সিকন্দর ও গোয়া নগরীর পর্তুগীজ শাসনকর্তা আলবুকার্ক এই প্রথা রহিত করেন (১৫১০ খ্রীঃ)। কিন্তু হিন্দু শাসনকর্তাদের মধ্যে পেশোয়া বাজীরাও ব্যতীত আর কেহ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে কোন হিন্দু নেতা যে এই নিষ্ঠুর প্রথা বোধ কবার চেষ্ট তো দূরের কথা ইহার মৌখিক প্রতিবাদ করিযাছিলেন এরূপ প্রমাণ নাই। মোটের উপর সহমরণ প্রথা বাড়িযাই চলিয়াছিল।

যে সেকল বিধবা সহমৃতা হইত না তাহারা যে সাধারণতঃ অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিত তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। বৃদ্ধহারীত-স্মৃতি মতে "বিধবারা কেশরঞ্জন, তাম্বুল, গন্ধ ও পুষ্পাদি সেবন, অলঙ্কার, রঙ্গীন কাপড, কাংস্য পাত্রে ভোজন, দুইবার ভোজন, নয়নে কাজলদান প্রভৃতি বর্জন করিবে, শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিবে, রাত্রে মাটিতে কুশ-শয্যায় শয়ন করিবে।" বাংলাদেশে বিধবারা কুশশয্যায় শয়ন ছাডা ইহার আর সব অনুশাসনগুলিই পালন করেন। কিন্তু শাস্ত্রের বিধান এই যে ইহা সত্ত্বেও বিধবারা সমাজে অপাংক্তেয় হইয়া থাকিবে। কারণ বিধবা মাত্রেই মূর্তিমতী অশুভ। স্কন্দ পুরাণে বলা হইয়াছে ঃ "অন্য সকল অমঙ্গল অপেক্ষা বিধবাই বেশী অমঙ্গলা। বিধবার দর্শনে কখনও কার্য সিদ্ধি হয় না। এক বিধবা মাতা ভিন্ন আর সকল বিধবাই মঙ্গল-বর্জিতা। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিধবার আশীর্বাদও সর্প-বিষের ন্যায় ত্যাগ করিবে।" উক্ত পুরাণে বিধবার মস্তক মুণ্ডনের ব্যবস্থা আছে এবং বর্জনের তালিকায় গোশকটে আরোহণ এবং কোন রকম জামা পরিধান যোগ করা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে "বিধবাকবরীবন্ধঃ ভর্তৃবন্ধায় জায়তে", অর্থাৎ বিধবারা কবরী বন্ধন করিলে তাহা মৃত পতির বন্ধন রজ্জু হয়। এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া পরবর্তী টীকাকারগণ বিধবার মস্তক মুণ্ডনের বিধি দিয়াছেন। কিন্তু

কবরীবন্ধন অর্থাৎ বেণী বা খোপা বান্ধা আর মাথায় চুল রাখা এক কথা নয়। বৃদ্ধহারীতের কেশরঞ্জন নিষেধের বিধিও চুল রাখারই সমর্থন করে, কারণ কেশ না থাকিলে তাহার রঞ্জনের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। অথচ ভারতের কোন কোন স্থলে বিধবার মস্তক-মুণ্ডন শাস্ত্রের নির্দেশ রূপে গৃহীত হইয়াছে। মোটের উপর সমাজে থাকিয়াও বিধবারা গৃহের সর্ববিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হইতে দূরে থাকিত এবং অশন-বসনের কষ্ট সহ্য করিত। তার উপর শাস্ত্রের নির্দেশ ছিল যে "যাবজ্জীবন তন্দ্রা ও আলস্য পরিহার করিয়া, ক্রোধশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, নির্মল সদাচারী, ব্রহ্মচারিণী, ধ্যানযোগপরায়ণা ও তপশ্চর্যা সংযুক্তা হইয়া জীবন ধারণ করিবে।" বাল্য বিবাহের ফলে সমাজে যে বহু সংখ্যক বালবিধবা ছিল তাহাদের পক্ষে এইরূপ জীবন যাপন করা কতদূর কষ্টকর ছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বাংলার প্রধান স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য বিধবার পক্ষে সহমরণ যে অবশ্য কর্তব্য এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বিকল্পে ব্রহ্মচর্য সাধনের ব্যবস্থাও যে শাস্ত্রানুমোদিত, নানা যুক্তিদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিধবার ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে তিনি পূর্বোক্ত বৃদ্ধ হারীত প্রভৃতির বিধানই সমর্থন করিয়াছেন, কেবল একাদশীতে উপবাস অবশ্যকর্তব্য রূপে নির্দেশ করিয়াও অসমর্থদের পক্ষে অনুকল্পে ফল, মুল, দুগ্ধ, জল ইত্যাদি পান ভোজনের অনুমতি দিয়াছেন। সম্প্রতি বঙ্গদেশীয়া একজন লেখিকা এই নিয়মের মধ্যে রঘুনন্দনের কোমল মনোভাবের সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিধবারা যাহাতে সৎপথে চলিতে পারেন তাহার জন্যই আহার, বিহার, চলাফেরা সম্বন্ধে রঘুনন্দন কঠোর ব্যবস্থা করিয়াছেন।* একাদশীতে উপবাস ভিন্ন অন্য যে সমুদয় কঠোর বিধি নিষেধের কথা পূর্বে

উল্লিখিত হইয়াছে অসংখ্য বালিকা বা যুবতী বিধবার পক্ষে তাহার কোন অনুকল্পের ব্যবস্থা না করায় তাহাদের জীবন কি বিষময় হইবে ইহা ধারণা করিয়াও রঘুনন্দনের "কোমল" হৃদয়ে কোন প্রতিক্রিয়া হয় নাই। সৎপথে চলা কেবল বিধবা নহে সকল নর-নারীরই জীবনের উদ্দেশ্য, সুতরাং লেখিকার যুক্তি অনুসারে বিপত্নীকেরও আহার-বিহার ব্যাপারে অনুরূপ কঠোরতা অবলম্বন করা উচিত। এ বিষয়ে রঘুনন্দনের প্রবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থা যে কতদূর নিষ্ঠুর হইতে পারে নবম বর্ষীয়া একটি বাল-বিধবার জীবন-বৃত্তান্ত হইতে সে সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে। এই শিশু এক বেলা খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিত না, এই জন্য মধ্যাহ্ন ভোজনের পর থালায় ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন রাখিয়া বালিকাটিকে তাহার পাশে শোয়াইয়া রাখা হইত—নিদ্রাভঙ্গে বৈকালে সেই থালার অন্ন ভোজন করিয়া সে দ্বিভোজনের মহাপাতক হইতে মুক্ত হইত। এইরূপ ভাবে বালিকা বা যুবতী বিধবাকে সৎপথে রাখিবার জন্য আজীবন সর্বপ্রকার সুখ ভোগ হইতে বঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা ধর্মের দোহাই দিলেও মানিয়া লওয়া কঠিন। বিপুল ভোগ-বিলাসের মধ্যে পরিবারের আর সকলেই সর্বপ্রকার সুখ ভোগ করিবে, কেবল দুর্ভাগ্যবশে যে কয়টি বালিকা বা যুবতী বিধবা হইয়াছে তাহাদিগকে জোর করিয়া সৎপথে চলিবার জন্য জীবন্মৃত অবস্থায় রাখিতে হইবে—মধ্যযুগে প্রায় প্রতি হিন্দুগৃহে এরূপ করুণ নাট্য অভিনীত হইয়াছে, অথচ ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ হয় নাই এবং বিপত্নীক পুরুষের প্রতি সৎপথে থাকিবার জন্য অনুরূপ বিধি ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। অথচ যে বেদকে আমরা হিন্দুধর্মের মূল বলিয়া গ্রহণ করি তাহাতে এবং অনেক শাস্ত্র গ্রন্থে বিধবার প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবস্থার উল্লেখ নাই; এমন কি বিধবার বিবাহেরও সমর্থন আছে। হিন্দু সমাজে এই

সব অশাস্ত্রীয় নিষ্ঠুর আচার রহিত করিবার প্রতিবন্ধকতা কি ছিল বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বোঝা যাইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আলিবর্দী ও সিরাজ-উদ্দৌল্লা যখন বাংলার নবাব, তখন বিক্রমপুরবাসী মহারাজা রাজ-বল্লভ একজন ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার একটি অল্পবয়স্কা কন্যা বিধবা হওয়ায় তিনি তাহার পুনর্বার বিবাহ দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে তিনি বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে এই মর্মে ব্যবস্থা সংগ্রহ করিলেন। তৎপর অনুরূপ ব্যবস্থার জন্য নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট ঐ সকল ব্যবস্থাপত্রসহ কয়েকজন পণ্ডিত পাঠাইলেন। নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইহার বিরুদ্ধবাদী হইলেন। তিনি রাজবল্লভ প্রেরিত পণ্ডিতদের আপ্যায়ন করিয়া তাহাদের নিকট খাদ্যদ্রব্যের সিধা পাঠাইলেন—প্রতি সিধার সঙ্গে একটি গোবৎস (মতান্তরে মহিষবৎস) ছিল। পণ্ডিতেরা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে খাদ্যদ্রব্য বহনকারী কর্মচারীরা বলিল—'আপনাদের আহারের জন্য মহারাজ পাঠাইয়াছেন। কারণ গো বা মহিষের মাংস ভোজন করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে।' পণ্ডিতেরা বলিলেন, 'কিন্তু এ দেশে এ মাংস ভোজনের ব্যবহার বা রীতি নাই।' কর্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন 'যখন শাস্ত্রসম্মত স্বীকার করিয়াও দেশাচার বিরুদ্ধ বলিয়া আপনারা গো বা মহিষের মাংস ভোজনে অসম্মত তখন শাস্ত্রসম্মত হইলেও দেশাচার বিরুদ্ধ বিধবা-বিবাহ আপনারা কোন্ যুক্তিতে প্রচলিত করিতে চান'? পণ্ডিতেরা চুপ করিয়া রহিলেন এবং রাজবল্লভের বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব এইভাবে পণ্ড হইল।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাল বিধবার বিষাদময় জীবনের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। শাঁখা-সিন্দুর বিহীনা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা

বিধবা কন্যাকে দেখিয়া মাতাপিতার মনের নিগূঢ় বেদনা ক্ষেমানন্দের মনসা মঙ্গলের নিম্নলিখিত পদটিতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে ঃ

"খনি বদলে দিব কাঁচা পাটের শাড়ী
(শাঁখা) শঙ্খ বদলে দিব সুবর্ণের চুড়ী।
সিন্দূর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি ॥"

বেদের পরবর্তী যুগে হিন্দুদের মধ্যে কন্যার বাল্য-বিবাহ, নিয়োগপ্রথা ও বিধবা-বিবাহ নিষেধ, বিধবার কঠোর ব্রহ্মচর্য, স্ত্রীজাতির জীবনব্যাপী স্বাতন্ত্র্যে অনধিকার এবং পতির প্রতি নির্বিচারে ভক্তি ও শ্রদ্ধা—সম্ভবতঃ এ সকলেরই মূলে ছিল স্ত্রীলোকের দৈহিক শুচিতা অর্থাৎ সতীত্বের অতিশয় উচ্চ এক আদর্শ। পতি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের দেহের স্পর্শে স্ত্রীলোক এতদূর অপবিত্র হয় যে তাহাকে ত্যাগ করা ভিন্ন অন্য কোন ব্যবস্থা অসম্ভব। মধ্যযুগে যে এই ধারণা কতদূর বদ্ধমূল ছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়, অজ্ঞাতসারে, বা বলপূর্বক যদি কোন পুরুষ তাহাকে ধর্ষণ এমন কি স্পর্শ করিত তাহা হইলেই সেই স্ত্রীলোক পতিতা বলিয়া গণ্য হইত, সমাজে বা গৃহে তাহার স্থান থাকিত না। পুরুষের বেলায়, অন্য ব্যবস্থা। এমন কি যে পুরুষ এইরূপ ধর্ষণ বা স্পর্শ করিত সে সমাজে স্বচ্ছন্দে এবং স্বাধীন ভাবে উন্নতশিরে বিচরণ করিত এবং তাহারই অপরাধে এক হতভাগিনী নারী চিরদিনের জন্য পতি, পুত্র, সংসার, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া জীবন্মৃত অবস্থায় কালযাপন করিত, এবং অনেক সময় জীবিকার জন্য দাসী বা গণিকা বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইত। তাহার পিতা, মাতা, বা স্বামীর ইচ্ছা থাকিলেও তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারিত না। একবার দেহ অশুচি হইলে কোন ক্রমেই

আর তাহার শুচিতা বিধান করা যাইত না। মুসলমান আমলে যে কত হিন্দু নারী এইভাবে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। নারীর দৈহিক শুচিতা বা সতীত্ব সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা পোষণ ও তাহার ফলে সমাজে নারীকে পতিত করিয়া তাহার চূড়ান্ত অপমান ও দুর্দশার সৃষ্টি মধ্যযুগের একটি বৈশিষ্ট্য এবং আধুনিক যুগেও ইহার প্রভাব খুব বেশী হ্রাস হয় নাই। কিন্তু প্রাচীন যুগের আদর্শ ও ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং আমাদের বর্তমান বদ্ধমূল ধারণার বিরোধী—সুতরাং এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন।

ঋগ্বেদে বিবাহিতা স্ত্রীর উপপতির উল্লেখ আছে (১-৬৬-৪ ; ১-১১৭-১৮ ; ১-১৩৪-৩)। কিন্তু ইহা যে গুরুতর অপরাধ বা দণ্ডনীয় এরূপ কোন আভাস পাওয়া যায় না। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১-৬-৫), শতপথ ব্রাহ্মণ (২-৫-২-২০), ও কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (৫, ৬-১০) বরুণ-প্রঘাস নামে একটি চাতুর্মাস্য যজ্ঞের উল্লেখ আছে। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় পুরোহিত যজ্ঞকারীর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, যে সে পতি ভিন্ন কয়জন পুরুষের সংসর্গ করিয়াছে। পত্নী যদি পরপুরুষের সংসর্গ করিয়া থাকে তবে তাহাদের নাম অথবা সংখ্যা বলিতে হয়। পরপুরুষের সহিত সংসর্গ স্বীকার করিলেও উক্ত স্ত্রীর অবস্থা পূর্ববৎ থাকে এবং সে পতিসহ আরব্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করে। স্বীকার করার ফলে তাহার পাপের লাঘব হয়, গোপন করিলে স্বজনের অনিষ্ট হয়।

পরবর্তী কালের স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অবৈধ মিলনের (মৈথুনের) নাম সংগ্রহণ। বৃহস্পতি-ধর্মশাস্ত্র অনুসারে সংগ্রহণ তিন প্রকার। প্রথম, কোন গোপন স্থানে স্ত্রীলোকের অনিচ্ছায় এবং তাহার বাধা দান ও চীৎকার সত্ত্বেও, অথবা

তাহার মত্ত বা উন্মত্ত অবস্থার সুযোগ লইয়া যখন পুরুষ তাহার সহিত মিলিত হয়, অর্থাৎ বলাৎকার। দ্বিতীয়, যখন কোন ছলে স্ত্রীলোককে বাটিতে আনাইয়া তাহাকে কোন ঔষধ (যেমন ধুতুরার রস) পান করাইয়া বা যাদু মন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত করিয়া পুরুষ তাহার সতীত্ব নষ্ট করে। তৃতীয়, যখন পরস্পরের সম্মতিক্রমে, অনুরাগের ফলে, এবং রূপ বা অর্থের লোভে, চক্ষুর দৃষ্টির সংকেত বা দূতীর সাহায্যে পুরুষ ও স্ত্রীর মিলন হয় অর্থাৎ অভিসার। বৃহস্পতির মতে প্রথম দুই প্রকার সংগ্রহণে পুরুষের কঠোর দণ্ড হইবে কিন্তু অনিচ্ছুক স্ত্রীলোক একেবারেই দণ্ডনীয় নহে। তবে পরপুরুষের সঙ্গে সহবাসজনিত পাপক্ষালনের জন্য তাহাকে কৃচ্ছ্র বা পরাক প্রয়শ্চিত্ত করিতে হইত। এই প্রায়শ্চিত্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্ত্রীকে পতিগৃহে গোপনে গন্ধদ্রব্য পরিহার ও অলঙ্কারাদি পরিত্যাগপূর্বক ভূশয্যায় শয়ন করিতে এবং খুব পরিমিত আহার করিতে হইত। প্রায়শ্চিত্ত হইলেই স্ত্রী পূর্ববৎ শুদ্ধ হইত। কিন্তু ইহার সহিত যোগ করা হইয়াছে যে ব্যভিচারকারী পুরুষ যদি ধর্ষিতা স্ত্রীলোকের অপেক্ষা হীন-বর্ণা হয় তাহা হইলে স্ত্রীলোককে ত্যাগ বা বধ করিতে হইবে। এই শেষোক্ত বিধানটি সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে যোগ করা হইয়াছে অথবা ইহা প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় প্রকার সংগ্রহণের বিহিত দণ্ড। কারণ তাহা না হইলে কেবলমাত্র ধর্ষণকারী পুরুষের জাতিভেদের জন্য ধর্ষিতা স্ত্রীর বিনা দণ্ড হইতে চরম দণ্ডের বিধান—এরূপ তারতম্য অত্যন্ত অসংগত মনে হয়। সে যাহাই হউক বৃহস্পতির উক্তি হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে বিবাহিতা স্ত্রীলোক ধর্ষিতা হইলেই তাহার দেহ অপবিত্র ও সে পতিতা ও ত্যাজ্যা বলিয়া পরিগণিত হইত না। মহাভারতেও অন্যায়রূপে ধর্ষিতা স্ত্রীলোকের কোন শাস্তির উল্লেখ নাই।

তৃতীয় শ্রেণীর সংগ্রহণ অর্থাৎ পর পুরুষের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া তাহার সহবাস করিলে স্ত্রীর দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ বিষয়ে শাস্ত্রকারদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। গৌতম-ধর্মসূত্রের মতে (২৩-১৪) নীচ জাতীয় পুরুষের সহিত ব্যভিচার করিলে রাজা সর্ব সাধারণের সমক্ষে ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে কুকুরের দ্বারা খাওয়াইবেন। কিন্তু সম বা উচ্চ জাতীয় পুরুষের সহিত ব্যভিচারে দণ্ডের কোন উল্লেখ নাই। মনুস্মৃতিতে এক স্থলে সকল ব্যভিচারিণীর সম্বন্ধেই ঐ একই দণ্ডের ব্যবস্থা (৮-৩৭১), কিন্তু আর এক স্থলে বলা হইয়াছে যে ব্যভিচার দোষে অতিশয় দুষ্টা স্ত্রীকে পতি একটি কক্ষে আবদ্ধ করিয়া ঐ দোষে দুষ্ট পুরুষের ন্যায় প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু সেই স্ত্রী যদি পুনরায় স্বজাতীয় পুরুষের আহ্বানে আবার ব্যভিচারিণী হয় তাহা হইলে কৃচ্ছ্র ও চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া শুদ্ধ করিয়া লইবে (১১-১৭৬-৭৭)। ব্যভিচারিণীর প্রতি সমাজের ব্যবহার ক্রমে ক্রমে কিরূপ পরিবর্তিত ও কঠোর হইয়াছিল মনুর এই পরস্পর বিরোধী দুই প্রকার বিধান হইতে তাহা বেশ বোঝা যায়। বশিষ্ঠ-ধর্মসূত্র মতে শূদ্রের সহিত ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণীর মাথা মুড়াইয়া, সর্বাঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া, নগ্নাবস্থায় কাল গাধার পিঠে চড়াইয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইলে তাহার শুদ্ধি হইবে (২১-১)। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে প্রায় সকল রকম ব্যভিচারিণীরই প্রায়শ্চিত্ত পূর্বক শুদ্ধির ব্যবস্থা আছে। আপস্তম্বের মতে (২-১০-২৪) নির্ধারিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্যভিচারিণী আবার পূর্বের স্ত্রীর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বশিষ্ঠ-ধর্মসূত্রে (২১-১২) আছে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্ত্রী যদি শূদ্রের সহিত ব্যভিচার করে এবং ইহার ফলে কোন সন্তান না জন্মে তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিলেই শুদ্ধ হয়। আবার পরের সূত্রেই আছে যে যদি কোন স্ত্রীলোক

নিম্ন জাতীয় পুরুষের সহিত ব্যভিচার করে তবে তাহাকে প্রথমে কৃচ্ছ্র ও পরে এক, দুই বা তিনটি চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এ বিষয়ে পরবর্তী কালের অত্রি (১৯৫-৬) ও দেবল স্মৃতির (৫০-৫১) ব্যবস্থা খুবই উদার। তাঁহাদের মতে স্ত্রীলোক অসমান-জাতীয় পুরুষের সহিত সহবাস করিলে, এমন কি ইহার ফলে গর্ভবতী হইলেও পতিতা বলিয়া গণ্য হইবে না। সন্তানের জন্ম বা পুনরায় রজঃস্বলা হইলেই তাহারা সুবর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ হইবে। তবে ব্যভিচার জনিত পুত্রের লালন পালনের ভার অন্যের উপর দিতে হইবে। দেবল (৪৭-৪৯) আরও বলিয়াছেন যে ম্লেচ্ছের দ্বারা ধর্ষিত এবং তাহার ফলে গর্ভবতী হইলেও নারী সন্তপন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে। পরাশরের মতে (১০-২৪, ২৫) নারী একবার ধর্ষিতা হইলে রজঃস্বলা হওয়ার পর প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হয়। একাধিকবার ধর্ষিত হইলে সন্তপন দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে। দেবল ও পরাশর উভয়ের স্মৃতিই মধ্য যুগে রচিত এবং দেবল ম্লেচ্ছ শব্দে মুসলমানদেরই লক্ষ্য করিয়াছেন। বাংলা দেশে মুসলমান যুগে যদি তাহাদের ব্যবস্থা অনুসৃত হইত তাহা হইলে সহস্র সহস্র হিন্দু নারী ধর্ম পরিবর্তন করিয়া মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইত না এবং হিন্দু জাতির ইতিহাস হয়ত অন্য রকম হইত। বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে যেরূপ এবং যে কারণে শাস্ত্রের নির্দেশ অপেক্ষা দেশাচারই বলবৎ হইয়াছিল এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। যে হিন্দু নশ্বর দেহকে অসার মনে করিয়া আত্মাকেই প্রাধান্য দিয়াছে, সেই হিন্দুই স্ত্রীলোকের দেহের শুচিতা রক্ষার জন্য ধর্ম ও সমাজের ধ্বংস করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। মধ্য যুগে যুদ্ধ যাত্রার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল নারীধর্ষণ। মুঘল সৈন্য প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধযাত্রা করে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা মুঘল সেনাপতি নিজেই করিয়াছেন। তিনি

লিখিয়াছেন যে পথে একস্থানে তাহার সৈন্যেরা চারি হাজার স্ত্রীলোক বন্দী করিয়া আনিয়া সকলকে বিবস্ত্রা করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দেন, কিন্তু তাহারা যে হিন্দু সমাজে স্থান পায় নাই তাহা বলাই বাহুল্য। ব্যভিচার দোষে স্ত্রীলোক পতি, পুত্র, গৃহ, সমাজ সকলই ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু কোন কোন শাস্ত্রকার এই কঠোরতা লাঘবের চেষ্টা করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির উক্তি (১-৭২) অনুসারে ব্যভিচারের পরে রজঃস্বলা হইলেই স্ত্রীলোক শুদ্ধ হয়, কিন্তু ইহার ফলে গর্ভবতী হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবে। এই উক্তির মিতাক্ষরা ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে এই ত্যাগ করিবার অর্থ স্ত্রীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা নহে, কেবল স্বামীর সহবাস ও ধর্ম কার্যে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে (৩-২৯৬, ২৯৭) যে স্ত্রী পতিত হইলেও তাহাকে অশন, বসন ও স্বীয় গৃহের নিকটে কুটীরে আশ্রয় দিতে হইবে। এই স্মৃতির একটি শ্লোকের (৩-২৯৭) মিতাক্ষরা টীকায় বলা হইয়াছে যে মাতা, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী প্রভৃতি সম্মানের পাত্রী নীচ জাতীয় পুরুষের সহিত ব্যভিচার করিলেও তাহারা ত্যাজ্যা নহে অর্থাৎ তাহাদিগকে গৃহ হইতে পথে বাহির করিয়া দিবে না—যদিও বশিষ্ঠাদি কোন কোন স্মৃতিতে এইরূপ মতই ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগে এই সব উদার মতকে কলিবর্জ্য বলা হইয়াছে অর্থাৎ কলিযুগে যে সব বিধি বর্জনীয় তাহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এখানে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকার কলিযুগ আরম্ভের পূর্বে বর্তমান ছিলেন এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহাদের বিধি বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মধ্যযুগের লোক যাহাতে প্রাচীন শাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রচলিত দেশাচার অমান্য না করিতে পারে তাহার জন্যই বহু পুরাণ নিয়ম ও প্রথা কলিবর্জ্য বলিয়া ঘোষণা করা

হইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক কলি যুগেও যে স্ত্রীলোকের দেহের শুচিতা রক্ষার সম্বন্ধে মধ্য যুগের ন্যায় কঠোরতা ছিল না কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (৪-১২) হইতে আমরা তাহা জানিতে পারি। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে "তিন বৎসর পর্যন্ত ক্রমাগত ঋতুগামিনী কন্যার বিবাহ না হইলে তৎসঙ্গমকারী পুরুষেব কোন দণ্ড হইবে না। বিবাহিতা কন্যা ব্যভিচার করিলে ৫৪ পণ দণ্ড হইবে।" এই অধ্যায়েই আবার আছে যে ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ১০০ পণ দণ্ড হইবে অথবা তাহাকে রাজদাসী হইতে হইবে।

মধ্যযুগের বাংলায় হিন্দু সমাজে ভদ্রবংশীয় গৃহস্থ ঘরের বধূদের সতীত্ব সম্বন্ধেও যে প্রকার সাধারণ সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল তাহা বর্তমানকালে আমাদের নিকট সমগ্র স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যন্ত অবমাননা সূচিত করে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তাহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। এই গ্রন্থের নায়ক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ধনপতি সওদাগর যখন দীর্ঘকালের জন্য দূরদেশে বাণিজ্য যাত্রা করেন তখন তাহার স্ত্রী খুল্লনা গর্ভবতী ছিলেন। পাছে সন্তান হইলে খুল্লনার কোন নিন্দা হয় এই জন্য ধনপতি যাত্রার প্রাক্কালে নিম্নলিখিত এক 'জয়পত্র' লিখিয়া রাখিয়া গেলেন।

"অশেষ মঙ্গল ধাম খুল্লনা যুবতী ॥
তোরে আশীর্বাদ প্রিয়া পরম পিরীতি।
সন্দেহ ভঞ্জন পত্র করিল নির্মিতি ॥
যখন তোমার গর্ভ হইল ছয় মাস।
সেইকালে নৃপাদেশে যাই পরবাস ॥"

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও খুল্লনার প্রতি সন্দেহের অবসান হইল না। স্বামীর অনুপস্থিতিকালে বড় সতীনের কুচক্রান্তে খুল্লনাকে দাসীর ন্যায় জীবন কাটাইতে হইত, এমন কি বনে বনে ছাগল চরাইতে হইত। এই জন্য ধনপতি সওদাগরের কুটুম্বগণ তাহার সতীত্ব

সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিল এবং স্পষ্ট ঘোষণা করিল যে বিধিমতে তাহার সতীত্ব পরীক্ষার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাহারা ধনপতির গৃহে ভোজন করিবে না। সুতরাং সেকালের প্রচলিত প্রথা ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অনুসারে খুল্লনাকে ক্রমে ক্রমে জলে ডোবা, সর্পদংশন, অগ্নিদহন, জতুগৃহদাহ প্রভৃতি নানাবিধ "দিব্য পরীক্ষা" দিয়া স্বীয় নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে হইল। ইহার মধ্যে অনেকটা কবির কল্পনা আছে। কিন্তু এই কাহিনীর মধ্য দিয়া যে জনসাধারণের মনে কুলবধূর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের ও অবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দিব্য পরীক্ষা দ্বারা দোষ নির্ণয়ের কথা মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যেও আছে।

মধ্যযুগে স্ত্রীর সতীত্ব বা দৈহিক শুচিতা সম্বন্ধে কঠোরতা যে পরিমাণে বাড়িয়াছিল পুরুষের সম্বন্ধে ঠিক সেই পরিমাণেই কমিয়াছিল। বহু বিবাহ ও উপপত্নী রাখার প্রথা খুবই প্রচলিত ছিল।

মধ্যযুগে কন্যার দেহের শুচিতা সম্বন্ধে যে পরিমাণে আগ্রহ ও উদ্বেগ ছিল তাহার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ঠিক সেই পরিমাণেই ঔদাসীন্য ও বিতৃষ্ণা ছিল। এই যুগের প্রারম্ভে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা যে কিছু কিছু প্রচলিত ছিল সমসাময়িক সাহিত্যে তাহার উল্লেখ আছে। সুতরাং তাহারা মোটামুটি লেখা পড়া জানিত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে লহনা, খুল্লনা, ও লীলাবতীর পত্র লেখা ও পত্র পাঠের উল্লেখ আছে—এবং ছেলে মেয়েদের একত্র পাঠশালায় যাওয়ার কথা আছে। কিন্তু বাল্য-বিবাহ ও অবরোধ প্রথার ফলে বালিকারা প্রাথমিক শিক্ষার বেশী অগ্রসর হইতে পারিত না। ক্রমে ক্রমে অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্ত্রীলোকের শিক্ষা প্রায় অপ্রচলিত হইয়া উঠিল। এমন কি হিন্দুদের মনে একটি দৃঢ় সংস্কার বদ্ধমূল হইল যে মেয়ে লিখিতে বা পড়িতে জানিলে তাহার বৈধব্য অবশ্যম্ভাবী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সম্ভ্রান্ত পরিবারে ও

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মেয়েদের লেখা পড়া শেখার কিছু ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ঘরের বালিকারা প্রায় নিরক্ষর ছিল। অবরোধ প্রথার দ্রুত প্রসারও ইহার অন্যতম কারণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে হিন্দু সমাজে স্ত্রীলোকদের অবরোধ প্রথা চরমে পৌঁছিয়াছিল। এ বিষয়েও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কতকটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। বলরাম দাসের পদাবলীতে আছে "সংকীর্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারি" অর্থাৎ কুলবধূরাও প্রকাশ্যে সংকীর্তনে যোগ দিতেন। অনেক বৈষ্ণব মহিলা প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে পুরী যাইতেন। অবরোধ প্রথা না থাকায় বৈষ্ণব মহিলাগণ অনেকে উচ্চ শিক্ষিতা ছিলেন। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবী খেতুড়ি মহোৎসবের সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক মন্ত্রশিষ্যও ছিল। অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া যে সাধনার রীতি প্রবর্তন করেন তাহা তাঁহার শিষ্যা নন্দিনী ও জঙ্গলীর বিবরণ হইতে জানা যায়। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতারও বহু মন্ত্রশিষ্য ছিল।

হিন্দু সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা প্রায় লোপ পাইলেও কয়েকটি বিদুষী মহিলার পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ হটী বিদ্যালঙ্কার ও হটু বিদ্যালঙ্কারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বালবিধবা কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা হটী রাঢ় দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও নব্যন্যায়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কাশীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন ও বিদ্যালঙ্কার উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি পুরুষ পণ্ডিতদের ন্যায় সভায় উপস্থিত হইয়া ন্যায় শাস্ত্রের বিচার করিতেন ও যথারীতি বিদায় লইতেন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয়া পণ্ডিত মহিলার প্রকৃত নাম রূপমঞ্জরী। তাঁহার

পিতা নারায়ণ দাস ব্রাহ্মণ না হইলেও কন্যাকে সংস্কৃত শিখান এবং তাঁহার মেধাশক্তির পরিচয় পাইয়া এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে রাখেন। রূপমঞ্জরী ১৬।১৭ বৎসর বয়স হইতে গুরুগৃহে টোলের ছাত্রদের সঙ্গে ব্যাকরণ পড়েন, পরে সাহিত্য, আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অনেক পুরুষ ছাত্র তাঁহার নিকট ব্যাকরণ এবং চরক সংহিতা, নিদান প্রভৃতি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তিনি চিরকুমারী ছিলেন, মাথা মুড়াইয়া পণ্ডিতদের মতন শিখা রাখিতেন এবং পুরুষের মত উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং একশত বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। এই দুইজন বিদুষী মহিলার চরিত আলোচনা করিয়া আমরা যেমন একদিকে গৌরব বোধ করি, তেমনি অন্যদিকে ইহা ভাবিয়া মন বিষাদে পূর্ণ হয় যে, সমাজের কুব্যবস্থায় নারী-শিক্ষা অনাদৃত না হইলে হয়ত বাংলাদেশে এরূপ অনেক বঙ্গ মহিলার উদ্ভব হইত।

সাধারণ শিক্ষার ন্যায় নৃত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি যে সকল শিল্পকলায় প্রাচীন কালে নারীর প্রাধান্য ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে লোপ পাইল। মধ্যযুগের শেষভাগে এই সকল বিদ্যা কেবল গণিকারাই চর্চা করিত—কোন হিন্দু ভদ্র পরিবারের মহিলাদের এইসব শিক্ষা কল্পনারও অতীত ছিল। ইহারও অন্যতম কারণ অবরোধ প্রথা। স্ত্রীলোকের দৈহিক শুচিতা রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ ও তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে অযৌক্তিক সন্দেহ, মুসলমানদের পর্দা প্রথার অনুকরণ এবং মুসলমান কর্তৃক হিন্দুনারী অপহরণ প্রভৃতি নানা কারণে সম্ভবতঃ অবরোধ প্রথা বাংলাদেশে ও উত্তর ভারতে সর্বসাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে মহারাষ্ট্রে ও দক্ষিণ ভারতে এই প্রথা কখনও বিস্তৃত হয় নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে ঐ সমুদয় অঞ্চলে

মুসলমান প্রভাবের আধিক্য না থাকাই ইহার কারণ। ইহা আংশিক সত্য হইলেও পুরাপুরি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। কারণ মুসলমান আগমনের পূর্বেও যে সম্ভ্রান্ত পরিবারে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে তাহার চিহ্ন মাত্র দেখা যায় না। অপর পক্ষে মহারাষ্ট্র বহু বৎসর মুসলমান রাজ্য ছিল কিন্তু রাজপুতানার আভ্যন্তরিক শাসনে মুসলমানদের প্রভাব খুবই কম ছিল। অথচ মহারাষ্ট্রে অবরোধ প্রথা নাই, কিন্তু রাজস্থানে ইহা খুবই কঠোরভাবে প্রতি-পালিত হইত। কিন্তু কারণ যাহাই হউক বাংলাদেশে যে মধ্য-যুগে কঠোর অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা ভিন্ন অন্য কোন নারী পুরুষের সঙ্গে ছাড়া এবং ঘোমটায় মুখ না ঢাকিয়া বাহিরে যাইত না। বাল্য-বিবাহ, শিক্ষার অভাব, বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধছেদ—এই সমুদয় কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে স্ত্রীলোকের অবস্থা অবনতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। কৌলীন্য প্রথা, সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন এবং বালবিধবার দুঃখময় জীবন প্রভৃতি এই অবনতির বাহ্যিক নিদর্শন মাত্র।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে উল্লিখিত মন্তব্য ও সমাজে নারীর অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে কেহ যদি সিদ্ধান্ত করেন যে মধ্যযুগের হিন্দু নারীর ন্যায় লাঞ্ছনা, অপমান ও নির্যাতন জগতে আর কোথাও কখনও ঘটে নাই তবে তিনি খুব ভুল করিবেন। আমাদের পরিচিত পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সর্বত্র সকল সুসভ্য জাতির মধ্যেই কোন না কোন যুগে নারীর অবস্থা অনেকটা এইরূপই ছিল। ইহা খুবই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এটি চিরন্তন লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় যে পুরুষ

সহজে নারীকে যথোচিত মর্যাদা ও শ্রদ্ধার আসন দিতে রাজী হয় নাই। প্রাচীন আসিরীয়, হিব্রু, গ্রীক, রোম ও চীনদেশীয় সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থা কি প্রকার ছিল তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া তুলনামূলক সমালোচনা করিলে হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে সুবিচার সম্ভবপর হইবে। স্বামী ও পিতার নিরঙ্কুশ আধিপত্য, ধনসম্পত্তিতে অনধিকার, পুরুষের বহুবিবাহ ও উপপত্নী পালন কিন্তু নারীর একাধিকবার বিবাহ নিষেধ, বিবাহ বিচ্ছেদে স্বামীর অধিকার কিন্তু স্ত্রীব অনধিকার, নিয়োগ ও অবরোধ প্রথা প্রভৃতি বহু প্রাচীন সমাজেই প্রচলিত ছিল। সুসভ্য রোম দেশে বন্ধুদের মধ্যে সাময়িকভাবে স্ত্রীর বিনিময় হইত, বন্ধুর অনুরোধে নিজের স্ত্রীকে তাহার সহিত বিবাহ এবং বন্ধুর মৃত্যু হইলে পুনবায় সেই পত্নীকে বিবাহ-করণ প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। সুসভ্য ইংলণ্ডে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করিলেও কোন প্রতীকার ছিল না; স্ত্রীকে আটক করিয়া রাখাও স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদেব পক্ষে পর্যাপ্ত অত্যাচার বলিয়া পরিগণিত হইত না; স্বামী পরিত্যাগ করিলে স্ত্রী নিজের ও সন্তানদের জন্য খোরপোষ দাবি করিতে পারিত না; স্ত্রীলোকের কোন সম্পত্তিতে অধিকার ছিল না—স্ত্রী কোন ধন-সম্পত্তি পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাতে স্বামীর অধিকার স্থাপিত হইত। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত জন স্টুয়ার্ট মিলের (John Stuart Mill) প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "*The Subjection of Women*" পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে আরও বহু তথ্য জানা যাইবে। অবশ্য অন্যদেশে অনুরূপ কুব্যবস্থা ছিল এই নজিরে নিজের দেশের দোষ খণ্ডন হয় না। কিন্তু তুলনামূলক সমালোচনা. এই সমুদয় দোষের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ও বিচারের সাহায্য করে, এই জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। মানব জাতির ইতিহাস পড়িলে মনে হয় মানুষের অত্যাচারে অবমানিত, উৎপীড়িত মানুষ এযাবৎ যত অশ্রু

বিসর্জন করিয়াছে তাহা একত্র করিলে এক বিশাল অশ্রু নদীর সৃষ্টি হইত এবং নির্যাতিতা নারীর নীরবে বর্ষিত নয়নবারিধারাই তাহার প্রধান শাখানদীরূপে পরিগণিত হইত।

পাদটীকা

১। দময়ন্তী, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দেবযানী, শর্মিষ্ঠা প্রভৃতি যে সব প্রাচীন মহিলার কাহিনী মহাভারতে আছে এবং উক্ত গ্রন্থের আখ্যানের পাত্রীদের মধ্যে সত্যবতী, অম্বিকা, অম্বালিকা, গান্ধারী, কুন্তী, মাদ্রী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, উলূপী প্রভৃতি সকলেরই যৌবন লাভ করিবার পরে বিবাহ হইয়াছিল। মহাভরতে উক্ত হইয়াছে: "অবিবাহিতা কন্যা ঋতুমতী হইলে তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে—তারপর নিজেই পতি স্থির করিবে।" (অনু-শাসন পর্ব—৪৪।১৬)। বালিকা-বিবাহের কোন দৃষ্টান্ত মহাভারতে নাই। কিন্তু ইহার বিধান আছে।

২। উদ্বাহতত্ত্ব পৃঃ ৪৬৮। শ্রীবাণী চক্রবর্তী প্রণীত "সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন"—পৃঃ ১৩৩।

৩। রঘুনন্দন যম—স্মৃতির একটি রচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—তাহার মর্ম এই যে "যাহার কন্যার ১২ বৎসর পর্যন্ত বিবাহ হয় নাই তাহার ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়—এরূপ স্থলে ঐ কন্যা স্বয়ং বর নির্বাচন করিয়া বিবাহ করিবে।" রঘুনন্দনও ইহা সমর্থন করিয়াছেন (ঐ পৃঃ ১৩৩)। কিন্তু যে যুগে রঘুনন্দনের মতানুযায়ী বাল্য-বিবাহ ধর্মের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত সে যুগেও কন্যা কর্তৃক স্বয়ং বর নির্বাচনের প্রথা অনুমোদন লাভ করে নাই—অর্থাৎ প্রাচীন মতের উদার অংশটুকু সমাজ গ্রহণ করে নাই।

পরাশর ও অন্যান্য বহু ধর্মশাস্ত্রের মতে রজঃস্বলা কন্যাকে ১২ বৎসর বয়সের পূর্বে বিবাহ না দিলে তাহার পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গুরুতর পাপ হয় এবং যে ব্রাহ্মণ এইরূপ কন্যাকে বিবাহ করে সে ব্রাহ্মণ ভোজনে অপাংক্তেয় হয়। অপর দিকে বায়ুপুরাণে এবং বহু ধর্মশাস্ত্রে অষ্টম বর্ষে গৌরী দানের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। বায়ুপুরাণে উক্ত হইয়াছে (৪৩, ৪৪) যে গৌরীদান করিলে উক্ত কন্যার গর্ভজাত সন্তানের পিতৃকুলে ২১ পুরুষ এবং মাতৃকুলে ৬ পুরুষের উদ্ধার হয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য Kane, *History of Dharmasastra*, II. pp. 440 ff. দ্রষ্টব্য।

সম্ভবতঃ এই সমুদয় উক্তি মধ্যযুগের অন্ধ সংস্কারের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু কারণ যাহাই হউক ৮।১০ বৎসর বয়সের বালিকার বিবাহই বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত সাধারণ প্রথায় পরিণত হইয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৩-ক। কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রীর সংখ্যা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা', দ্বিতীয় খণ্ড—১৮৩ পৃষ্ঠা।

৪। এ বিষয়ে কয়েকজন বিদেশী ভ্রমণকারীর উক্তির জন্য দ্রষ্টব্য: Dr. Kalikinkar Datta, *Education and Social Amelioration of Women in Pre-Mutiny India*, pp. 67 ff. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা', তৃতীয় খণ্ডে (১৪৩-১৪৬ পৃষ্ঠায়) কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে।

৫। বিচিত্র প্রবন্ধ, মাভৈঃ (পৃঃ ৩)।

৬। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪৭।

৭। Kane, P. V.—*History of Dharmasastra*, Vol. II, P. 635.

৮। K. K. Datta—*Education and Social Reforms*, P. 63.

৮-ক। ৪নং পাদটীকায় উল্লিখিত ইংরেজী গ্রন্থের ৬৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি দ্রষ্টব্য।

৯। শ্রীবাণী চক্রবর্তী—সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন, পৃঃ ২২৫-২২৭।

পঞ্চম বক্তৃতা

উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গনারী

আমার পূর্বেকার তিনটি বক্তৃতায় আমি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে ঋগ্‌বেদ সংহিতার যুগে ভারতে নারীজাতির অবস্থা খুবই উন্নত ছিল, তাহার পর ক্রমশঃ অবনতি আরম্ভ হয়, এবং মধ্য-যুগের শেষে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই অবনতি চরম সীমায় পৌঁছে। উনবিংশ শতাব্দীতে আবার স্ত্রীলোকের অবস্থা কিরূপে ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় তাহাই এই শেষ বক্তৃতায় আলোচনা করিব।

এই উন্নতির মূলে ছিল নারীজাতির দুরবস্থা সম্বন্ধে জাতীয় চেতনার উদ্বোধন। সম্ভবতঃ ইংরেজী শিক্ষা ও তৎসহ পাশ্চাত্য জাতির প্রভাবেই এই চেতনার উন্মেষ ও বৃদ্ধি হয়। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে এই চেতনার অর্থাৎ স্ত্রীজাতির দুর্দশায় সমাজে বেদনার অনুভূতির কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। মহারাজা রাজবল্লভ নিজের বিধবা কন্যার দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবা-বিবাহ পুনঃ প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন—এইরূপ ব্যক্তিগত প্রয়াসের দৃষ্টান্ত হয়ত আরও দুই একটি আছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে হিন্দু সমাজে বহু শতাব্দী ব্যাপী স্ত্রীলোকের দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া, ইহার প্রতীকার চেষ্টা তো দূরের কথা ইহার জন্য দুঃখ প্রকাশের কোন পরিচয়ও উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পাওয়া যায় না। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে এই বেদনা বোধ পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গমহিলাদের দুঃখময় জীবনের একটি জীবন্ত চিত্রও ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে এইরূপ প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট প্রমাণ ইহার পূর্বে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহার কয়েকটি নমুনা দিতেছি।

১৮১৯ খ্রীঃ রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির দুরবস্থার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যথাসম্ভব তাঁহারই ভাষায় সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

"দেখ কি পর্যন্ত দুঃখ, অপমান. তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্মভয়ে সহ্য করে। অনেক কুলীন কন্যারই বিবাহের পর যাবজ্জীবনের মধ্যে দুই চারিবার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয় তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই পিতৃগৃহে বা ভ্রাতৃগৃহে নানা দুঃখ সহ্য পূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম নির্বাহ করেন।···আর সাধারণ গৃহস্থের বাটিতে স্ত্রীলোক কি দুঃখ না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু তাহাদের সহিত পশুবৎ অধম ব্যবহার করেন। স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জন গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ম করিয়া থাকে; এবং বৃহৎ পরিবারের সূপকারের কর্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে। ···ঐ রন্ধনে ও পরিবেষনে যদি কোন অংশে ত্রুটি হয় তবে তাহাদের স্বামী, শাশুড়ি দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন। এ সকলই স্ত্রীলোকেরা ধর্মভয়ে সহ্য করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে তাহা সন্তোষ পূর্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে। আর দরিদ্র ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাটীর স্ত্রীলোকেরা গোসেবাদি কর্ম করেন, পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জল আনয়ন করে, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম তাহাও করে, মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার পায়। যদি দৈবাৎ ঐ স্বামী ধনী হয় তবে ঐ স্ত্রীর সর্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায়ই ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয় এবং মাসমধ্যে এক দিবসও স্বামী স্ত্রীর আলাপ হয় না।

"যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে তাহারা দিবা রাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়। কখনও স্বামী এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্বদা তাড়ন করে, আবার কেহ কেহ সামান্য ত্রুটি পাইলে বা বিনা কারণে সন্দেহ বশতঃ স্ত্রীকে চোরের তাড়না করে (অর্থাৎ চোরের ন্যায় প্রহার করে)। অনেক স্ত্রীই ধর্মভয়ে এ সকলই সহ্য করে কিন্তু যদি কেহ এইরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া পৃথক থাকিবার নিমিত্ত পতির গৃহ ত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রভাব থাকায় পুনরায় পতির হস্তে আসিতে হয়, এবং পতিও পূর্বজাতক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে স্ত্রীকে ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে।" (সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ)

রামমোহনের এই বর্ণনার প্রায় শতবর্ষ পরে আমার বাল্যকালের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে তাঁহার উক্তি অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। উপসংহারে রামমোহন গোঁড়া হিন্দু নেতাদের লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—"এই সকল বর্ণনা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না, দুঃখ এই যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী স্ত্রীলোকদিগকে দেখিয়াও আপনাদের কিঞ্চিৎ দয়া উপস্থিত হয় না যাহাতে বন্ধন পূর্বক দাহ করা (অর্থাৎ সহমরণ) হইতে রক্ষা পায়।"[১]

রামমোহন রায়ের এই লেখা প্রকাশিত হইবার দুই বৎসর পূর্বে ১৮১৭ খ্রীঃ কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য ভাব ধারায় এই কলেজের ছাত্রেরা এবং অন্যান্য অনেকেও স্ত্রী-জাতির দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হন এবং তাহাদের উন্নতি সাধনকল্পে অগ্রসর হন। পারিপার্শ্বিক প্রভাবে ও শিক্ষার ফলে স্ত্রীজাতির মনেও নিজেদের দুরবস্থা সম্বন্ধে তীব্র চেতনার সঞ্চার হয়। ১৮৩৫ খ্রীঃ ১৪ই মার্চ 'সমাচার দর্পণ' নামে প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে

প্রকাশিত 'কাচিৎ শান্তিপুর নিবাসিনী' স্বাক্ষরিত একখানি পত্রে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রের সারমর্ম নিম্নে দিতেছি।

"ইংরেজ রাজ্যের অনেক স্থলেই বিধবাদের পুনরায় বিবাহ হয়। কেবল বাঙ্গালীর মধ্যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ কন্যা বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয় না এবং কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সমমেল না হইলে বিবাহ হয় না। যদি ঐ স্ত্রীলোকেরা উপপতি আশ্রয় করে তবে যে কুলোদ্ভবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্তু বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরা অনায়াসে বেশ্যালয়ে গমন পূর্বক উপস্ত্রী লইয়া সম্ভোগ করেন তাহাতে কুল নষ্ট হয় না। বরং তাহারা মান্য হইয়া ধন্যবাদ পাইতেছেন। কেবল স্ত্রীলোকের নিমিত্ত সমন্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাঙ্গালা শাস্ত্রমতে এমত আছে যে অপ্রৌঢ়া বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। প্রাচীনকালে রাণীরা পতি অভাবে পুনঃ স্বয়ম্বরা হইয়াছেন এবং স্বামিসত্ত্বে অনায়াসে উপপতি লইয়া সম্ভোগ করিয়াছেন তাহাতে ধর্ম বিরুদ্ধ হয় নাই। অদ্যাপিও তাহাদিগের নাম উচ্চারণে এবং স্মরণে পাপধ্বংস হয়। এইক্ষণে ঐ সকলে পুরুষদিগের ধর্মবিরুদ্ধ হয় না। কেবল স্ত্রীলোকের সুখ সম্ভোগ নিষেধার্থে কি ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ তন্ত্র সৃজন হইয়াছিল? আমাদের বেশভূষা উত্তম আহার্য দ্রব্য ও পতি সংসর্গ বর্জিতা হইয়া অসহ্য বিরহ বেদনায় বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া কি নিমিত্ত কাল যাপন করিতে হয়? আমাদিগের ধর্মশাস্ত্রে এই যাতনা নিবারণের উপায় আছে। অতএব নিবেদন এই যে ধার্মিক রাজা ইংরেজ বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্বক প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে আইন করুন। কিম্বা বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়দিগের উপস্ত্রী সহিত সম্ভোগ রহিত করুন।"[২]

এই পত্র প্রকাশিত হইবার এক সপ্তাহ পরে উক্ত পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় চুঁচুড়া নিবাসিনী স্ত্রীগণের একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। ইহাতে তাঁহারা তাঁহাদিগের 'পিত্রাদি ও ভ্রাতৃবর্গের' উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্ন ও আবেদন করিয়াছেন। তাহার সারমর্ম এই:

১। সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয় সেইরূপ আমাদিগের কেন হয় না ?

২। অন্য দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি করে আমাদিগকে তদ্রূপ করিতে দেন না কেন ?

৩। বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় আমাদিগকে কি নিমিত্ত পরহস্তে দান করেন ? আমরা কি নিজেরা বিবেচনাপূর্বক স্বামী মনোনীত করিতে পারি না ? আপনারা কুল, ধর্ম ও সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য যাহাদের সঙ্গে আমাদের কখন কিছু জানা শোনা নাই এবং বিদ্যা বা রূপ ধনাদি কিছুই নাই এমত পোড়াকপালিয়াদের সঙ্গে কেবল ছাইর কুলের নিমিত্ত আমাদের বিবাহ দিতেছেন এবং ১০।১২ বৎসর বয়সে অজ্ঞানাবস্থায় আমাদিগকে দান করিতেছেন। সংসারের মধ্যে প্রবেশের এই কি উচিত সময় ? ইহাতে কি কুফল হইতেছে তাহাও আপনারা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন।

৪। আপনারা কেহ কেহ টাকা লইয়া আমাদিগকে বিবাহ দিতেছেন। তাহাতে যাঁহারা মূল্য অধিক ডাকেন তাঁহারাই আমাদের স্বামী হন এবং আমরা তাঁহাদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হই।

৫। যাঁহাদের অনেক ভার্যা আছে তাঁহাদের সঙ্গে কেন আমাদের বিবাহ দিতেছেন ? যাঁহার অনেক ভার্যা আছে তিনি প্রত্যেক ভার্যা লইয়া সাংসারিক যেমন রীতি ও কর্তব্য তাহা কিরূপে করিতে পারেন ?

৬। ভার্যার মৃত্যুর পরে স্বামী পুনর্বিবাহ কবিতে পারে। তবে কেন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পরে বিবাহ করিতে না পারে ? পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে অনুরাগ তেমন কি স্ত্রীর নাই ? এই স্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি দুষ্টতার দমন হয় ?'[৩]

এইরূপ আরও অনেক পত্র এবং তাহার উত্তর সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে পূর্বোদ্ধৃত

পত্র দুইখানি বাস্তবিক স্ত্রীলোকের লেখা নহে—কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের নামে লিখিয়াছে। কিন্তু যাহারই লেখা হউক এই পত্রগুলি হইতে বেশ বোঝা যায় যে স্ত্রীজাতির দুরবস্থা সম্বন্ধে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে বেদনাবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে এবং এই নবজাগ্রত চেতনা স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মনেই সাড়া জাগাইয়াছে। এই সময় হইতে স্ত্রীজাতির সর্ববিধ উন্নতির জন্য যে আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা উনবিংশ শতাব্দীতে বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে সুফল প্রসব করিয়াছে। ইঁহার পূর্বে পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে স্ত্রীজাতির দুরবস্থা সম্বন্ধে এরূপ বেদনাবোধ বা প্রতীকারের চেষ্টা হইয়াছে এরূপ কোন প্রমাণ মাই। যদিও প্রধানতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষাব প্রভাবেই ইহার সূত্রপাত হয তথাপি, ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে এক শ্রেণীর শাস্ত্রজ্ঞ বাঙ্গালী পণ্ডিতও কালধর্মের প্রভাবে সমাজ সংস্কার বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়া বিগত একশত বৎসরে স্ত্রীজাতি দ্রুতবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। আধুনিক যুগে বাঙ্গালী তথা ভারতীয় নারীর যে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সত্যই বিস্ময়কর ও অভাবনীয়। প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের শিক্ষা বিস্তারই এইরূপ অসাধ্য সাধন করিয়াছে। বংশপরম্পরাগত শত শত কুসংস্কারের ফলে স্ত্রীজাতির লেখা পড়া প্রায় লোপ পাইয়াছিল। কিরূপে ইহা ধীরে ধীরে বহুলোকের চেষ্টার ফলে আবার প্রসার লাভ করিয়াছে প্রথমে তাহারই আলোচনা করিব।

সরকারের আদেশে মিঃ অ্যাডাম (Adam) বাংলাদেশে সর্বত্র ঘুরিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে যে রিপোর্ট দেন[৫] তাহা পাঠ করিলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যায়। তখন মেয়েদের শিক্ষার জন্য কোন পাঠশালা ছিল না—

দুই চারি জন বাড়ীতে কিছু লেখা পড়া করিতেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ বাংলাদেশের রাজধানী ছিল, কিন্তু অ্যাডাম্‌স্‌ লিখিয়াছেন যে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জিলায় মাত্র নয়টি স্ত্রীলোক বই পড়িতে ও কোনমতে নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে পারিত। অন্য যে সব স্থানে তদন্ত করা হইয়াছিল সেখানে দুই একটি জমিদার পরিবার বা বৈষ্ণবের আখড়া প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়ের বাহিরে কোন মতে লিখিতে বা পড়িতে পারে এমন একটি স্ত্রীলোকও ছিল না। ইহার প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ, অবরোধপ্রথা ও তৎকালে প্রচলিত একটি বদ্ধমূল সংস্কার যে স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হইবে। অবশ্য কলিকাতায় ও অন্যত্র সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কয়েকটি বিদুষী ছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। ইঁহাদের মধ্যে মহারাজা সুখময় রায়ের পৌত্রী ও রাজা শিবচন্দ্র রায়ের কন্যা হরসুন্দরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে এক বৈষ্ণবীর নিকট অক্ষর শিক্ষা করেন এবং রাজবাটির এক প্রাচীন ব্রাহ্মণের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। কিন্তু এ সকলই গোপনে করিতে হইত। একদিন অন্তঃপুরে একাকিনী এক কক্ষে বসিয়া মৃদুস্বরে রামায়ণ পাঠ করিতে-ছিলেন এমন সময় তাঁহার পিতা হঠাৎ অন্তঃপুরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ ঘরে পাঠ করে কে? রাজকন্যা ভীতা হইয়া গোপনীয় স্থানে গ্রন্থ রাখিয়া লজ্জিতভাবে পিতার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি লেখাপড়া শিখিয়াছ, কি কি পড়িয়াছ, আমার সাক্ষাতে বল, কোন ভয় নাই। রাজকন্যা সমুদয় বলিলে পিতা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়া বলিলেন যে ইহার সুদ হইতে তুমি ইচ্ছামত গ্রন্থাদি ক্রয় করিবে। অতঃপর তাহার বিবাহ হইল। শ্বশুরবাড়ীতে প্রকাশ্যে গ্রন্থপাঠ করিতে পারিতেন না, কিন্তু গোপনে নানা পুস্তক পাঠ

করিতেন। তাঁহার স্বামী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ লোকনাথ মল্লিক নিরক্ষর ছিলেন।[৫] এই কাহিনী হইতে সেকালে সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যাদেরও বিদ্যাভ্যাস কিরূপ দুরূহ ও আয়াসসাধ্য ছিল তাহা বুঝা যাইবে। এই প্রসঙ্গে দ্রবময়ী দেবীর নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বালবিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া, পিতা বৃদ্ধ হইলে তাহার টোলে ছাত্রদের পড়াইতেন।[৬] কিন্তু এইরূপ দুই একটি ব্যতিক্রম থাকিলেও সাধারণ গৃহস্থ ঘরের বালিকারা প্রায়ই নিরক্ষর ছিল। বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম চেষ্টা করেন খ্রীষ্টীয় মিশনারীরা। ১৮১৯ খ্রীঃ তাঁহারা **Calcutta Female Juvenile Society** নামে একটি সমিতি স্থাপিত করিয়া এ দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রথম বছরে ৮০ জন এবং ছয় বছর পরে ছয়টি স্কুলে মোট ১৬০ জন ছাত্রী ছিল। কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েরা এই সব বিদ্যালয়ে যাইত না। বাগদী, বৈরাগী, বেদে এবং গণিকাদের কন্যারাই পড়িত।

১৮২১ খ্রীঃ ইংলণ্ডের **Foreign School Society** কলিকাতা স্কুল সোসাইটির সাহায্যে এদেশে নারীদের শিক্ষার জন্য বিলাতে চাঁদা তুলিয়া মিস্ কুক নামে একজন শিক্ষয়িত্রী পাঠাইলেন[৭]। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য কলিকাতা স্কুল সোসাইটির একটি সভা আহ্বান করিবার প্রস্তাব হইলে ইহার ভারতীয় সম্পাদক রাজা রাধাকান্ত দেব ইউরোপীয় সম্পাদককে লিখিলেন যে "ভদ্র হিন্দু পরিবারেরা মিস্ কুকের স্কুলে মেয়ে পাঠাইবে না এবং তাঁহাকে নিজেদের বাড়ীতে যাইয়া মেয়েদের শিখাইবার অনুমতি দিবে না। সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনার জন্য সভা ডাকিবার প্রয়োজন নাই।" মেয়েদের স্কুলে পাঠাইবার দুইটি গুরুতর বাধা ছিল। খ্রীষ্টান ধর্ম শিক্ষার ভয় এবং নীচ জাতীয়া ও গণিকার কন্যাদের সঙ্গে একত্রে পড়াশুনা করা। এইসব বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও মিস্ কুকের যত্ন ও

অধ্যবসায়ের ফলে প্রায় ৩০টি স্কুল স্থাপিত হইল—মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬০০। অতঃপর আর ছোট ছোট স্কুলের সংখ্যা না বাড়াইয়া একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। পূর্বোক্ত মহারাজা সুখময় রায়ের পুত্র বৈদ্যনাথ রায় ইহার জন্য বিশ হাজার টাকা চাঁদা দিলেন এবং ১৮২৬ খ্রীঃ বড়লাটের পত্নী লেডী আমহার্স্ট এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। এইরূপে মিশনারীরা বহু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন কিন্তু ভদ্র ঘরের মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ প্রসার হইল না। তাঁহাদের কুসংস্কার দূর করার জন্য ১৮২২ খ্রীঃ গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। দুই বৎসরের মধ্যেই ইহার দুই সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। ১৮২৪ সনে প্রকাশিত ইহার তৃতীয় সংস্করণের গোড়ায় দুইটি বধূর কাল্পনিক কথোপকথন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"প্রথমা—ওগো এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা, কালে কালে কতই হবে—ইহা তোমার মনে কেমন লাগে।

দ্বিতীয়া—তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমাদের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়।

প্রঃ—কেন গো। সে সকল পুরুষের কাজ। তাহাতে আমাদের ভাল মন্দ কি?

দ্বিঃ—স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া করে না ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কাজ করিয়া কাল কাটায়।

প্রঃ—স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কাজ, রাঁধা বাড়া, ছেলাপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন? তাহা কি পুরুষেরা করিবে?

দ্বিঃ—না পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখা পড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কাজ কর্ম সারিয়া অবকাশ মত দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

প্রঃ—কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকেরা কহেন যে লেখা পড়া যদি স্ত্রীলোক করে তবে সে বিধবা হয়। যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।

দ্বিঃ—না বইন; আমার ঠাকুরাণী দিদি ঠাঁই শুনিয়াছি যে কোন শাস্ত্রে এমত লেখা নাই যে মেয়ে মানুষ পড়িলে বিধবা হয়। কত স্ত্রীলোকের বিদ্যার কথা পুরাণে শুনিয়াছি—সংপ্রতি সাক্ষাতে দেখনা কেন, বিবিরা তো সাহেবের মত লেখা পড়া জানে, তাহারা কেন বিধবা হয় না।

প্রঃ—যদি দোষ নাই তবে এতদিন এদেশের মেয়্যা মানুষে কেন শিখে নাই? কন্যারা পাঠশালায় যায় না কেন?

দ্বিঃ—হেদে দেখ দিদি বাহির পানে তাকাইতে দেয় না। যদি ছোট ছোট কন্যারা বাটির বালকের লেখা পড়া দেখিয়া সাধ করিয়া কিছু শিখে ও পাৎতাড়ি হাতে করে তবে তাহার অখ্যাতি জগৎ বেড়ে হয়। সকলে কহে যে এই মদ্দা টেঁটি ছুঁড়ি বেটা ছেলের মত লেখা পড়া শিখে, এ ছুঁড়ি বড় অসৎ হবে। এখনি এই, শেষে না জানি কি হবে। যে গাছ বাড়ে তাহার অঙ্কুরে জানা যায়।"

এই সুদীর্ঘ কথোপকথনের মধ্য দিয়া সে কালের চিত্র স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু আর বেশী উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে। পরে এই দুইটি স্ত্রীলোক স্থির করিল যে পাড়ার যে সমুদয় নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা পাঠশালায় যায় তাহাদের নিকট গোপনে অক্ষর পরিচয়ের ব্যবস্থা করিবে।

মিশনারীদের চেষ্টার ফলে যে বাংলার হিন্দু সমাজে স্ত্রীশিক্ষা

সম্বন্ধে খুব একটি সাড়া জাগিয়াছিল এবং ইহার বিরুদ্ধবাদী প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে ইহার সমর্থনকারী নব্য একদলের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল, সমসাময়িক সংবাদ পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 'সমাচার দর্পণ', 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রভৃতি পত্রিকায় এ বিষয়ে খুব বাদানুবাদ হয়—তাহার একটু নমুনা দিতেছি।

১৮২২ সনে ৬ই এপ্রিল জনৈক লেখক স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে 'প্রাচীন কালের মৈত্রেয়ী, অনসূয়া, দ্রৌপদী, রুক্মিণী, চিত্রলেখা, লীলাবতী, কর্ণাটরাজ-স্ত্রী, লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী ও খনা ইত্যাদি এবং আধুনিক কালের মহারাণী ভবানী, হটী বিদ্যালঙ্কার, শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী প্রভৃতির নানা শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাতে পারদর্শিতা উল্লেখ করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা এবং ইহাতে যে কোন দোষ নাই তাহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

১৩ই এপ্রিল আর একজন লেখকও কয়েকজন বিদূষী মহিলার উল্লেখ করিয়া পরে লিখিয়াছেন: "এখনও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে ইংলণ্ডীয় স্ত্রীগণের আনুকূল্যে কন্যাদিগের পাঠার্থে যে পাঠশালা হইয়াছে তাহাতে যে বালিকারা শিক্ষা করিতেছে তাহার মধ্যে কেহ এক বৎসরে কেহ দেড় বৎসরে লিখাপড়া শিখিয়াছে। তাহারা যে ভাষা পুস্তক কখন দেখে নাই তাহা অনায়াসে পাঠ করিতে পারে। ইহাতে বোধ হয় যে স্ত্রীলোক যদি বিদ্যাভ্যাস করে তবে অতি শীঘ্র জ্ঞানাপন্না হইতে পারে। অতএব যেমত গৃহকর্মাদি শিক্ষা করান সেমত বালক কালে বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত। যেহেতু স্ত্রীলোক অবীরা (অনাথা) হইলেও বার্তা বিদ্যাদ্বারা আপন ধন রক্ষা করিয়া কাল যাপন করিতে পারে, অন্যের অধীন হইতে হয় না, এবং অন্যে 'প্রতারণা' করিতে পারে না।"

এবারে স্ত্রীশিক্ষা বিরোধীদের উক্তিরও দুইটি নমুনা দিতেছি।

১৮৩১ সনে একজন লিখিয়াছেন :

"স্ত্রীলোকের লেখাপড়া করাওনের প্রয়োজন কি? যদি বল লিখন পঠন বিনা তাহাদের জ্ঞান জন্মিতে পারে না তাহার উত্তর এই—প্রথমতঃ এমন কোন পুরুষবর্জিত দেশ নাই যেখানে পাটোয়ারিগিরি, মুহুরিগিরি, নাজীরী, জমিদারী ও আমীরী নারী বিনা সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয়ত কেবল বাংলা ফলা বানান প্রভৃতি শিখিলেই যে পারমার্থিক ও নীতি ও পূর্ববৃত্তান্ত অথবা অন্য অন্য লৌকিক জ্ঞান জন্মিবে এমন ভাবা পাগলের প্রলাপ মাত্র। যেহেতু বাংলা ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যাহাতে এই সমুদয় বিষয়ে জ্ঞান জন্মে।"

ইহার একমাস পরে আর একজন লিখিয়াছেন : "দর্পণ প্রকাশক মহাশয় লেখেন যে মনুষ্য হইয়া অর্ধাঙ্গ স্ত্রীকে যে পশুভাবে দেখা এ কোন ধর্ম? উত্তর—ইহাই তাবদ্ বিশিষ্ট হিন্দু জাতির কুলধর্ম। অপর লেখেন যে এখনকার রাণী ভবানী, হটী বিদ্যালঙ্কার, শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী ইহারাও দর্শন বিদ্যাতে অতি সুখ্যাতি পাইয়াছেন। উত্তর—শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শন অধ্যয়নে স্ত্রীজাতির আদৌ অধিকার নাই।··· উক্ত কয়েকজন বিপ্রকন্যার বিদ্যাবিষয়ের উপাখ্যান আমাদিগের কোন শাস্ত্রে লেখা নাই। তবে কি শুদ্ধ স্কুল বুক সোসাইটির গদ্য পদ্য রচিত পুস্তকের প্রমাণে হিন্দু বিশিষ্ট সন্তানেরা আপন কুলাঙ্গনাদের পাঠশালায় পাঠাইয়া বারাঙ্গনা করিবেন।" আর একজন লিখিয়াছেন স্ত্রীলোকের বেদপাঠ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে যেহেতু তাহারা শূদ্রতুল্য। ইহার উত্তরে একজন লিখিয়াছেন তবে তাঁহার স্ত্রীর অন্নভোজনে শূদ্রান্ন ভোজনের দোষ হয়। কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে হিন্দু স্ত্রীলোকেরা যদি মেমদের মতন বিদ্যালয়ে যাইতে পারে তবে তাহাদের মতন একাধিকবার বিবাহও করিতে পারে। আবার কেহ কেহ লিখিয়াছেন মেয়েরা বিদ্যালয়ে গেলে দুশ্চরিত্রা হইবে এবং এমন

অনেক উক্তি করিয়াছেন যাহা বর্তমান যুগে ইতর ও অশ্লীল বলিয়া বিবেচিত হয়।[৮]

ঊনবিংশ শতাব্দের দ্বিতীয় পাদে স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন হয়। ইংরেজী শিক্ষিত নব্য যুবকদল সভা সমিতিতে বক্তৃতা ও সংবাদপত্রে প্রবন্ধ দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করেন। সনাতনপন্থীরা ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক রচনা ছাপাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই— স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনকারীদের সমাজচ্যুত করিবার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন কোন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে এবং কোন কোন শাস্ত্রীয় পণ্ডিত ইহার সপক্ষে আন্দোলন করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার' (Hindu Intelligencer) পত্রের সম্পাদক প্রসিদ্ধ ইংরেজী শিক্ষিত কাশীপ্রসাদ ঘোষ হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করেন। অপর পক্ষে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তাঁহার 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় লেখেন : "আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম, স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি"। পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর কাশীপ্রসাদের বিরুদ্ধ আলোচনার উত্তরে লেখেন, "হে সম্পাদক মহাশয়, হিন্দু বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিলে কি কি অনিষ্ট সম্ভাবনা আপনি একাদিক্রমে তাহা প্রকাশ করুন, আমরা মহাশয়ের প্রতি কথার উত্তর দিব, যদি উত্তর প্রদানে অশক্ত হই তবে আপনি জয়ী হইবেন"।[৯]

পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'য় ১৭৭২ শকাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা বিরোধীদলের সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে তিনি বলেন :

"বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই ন্যূনাধিক্য স্থাপন করেন নাই। অতএব বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে, বালিকারা সেরূপ কেন না পারিবেক?"[১০]

রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মের নেতা রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করিতেন, তবে প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এই সমুদয় আপত্তি সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে নানাস্থানে অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। অপর দিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ইহাতে প্রাণপণে বাধা দিতে লাগিল। কলিকাতার বাহিরে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা কিরূপ দুরূহ ছিল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১৮৪৯ সনে কয়েকটি নব্যপন্থী নেতার চেষ্টায় বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু আয়াসে তাঁহারা কয়েকটি ভদ্রগৃহস্থ ঘরের মেয়েদের ছাত্রীরূপে সংগ্রহ করিলেন। ইহাতে বিরোধীদল উত্তেজিত হইয়া এই সব ছাত্রীর অভিভাবকদের এবং বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিল, প্রকাশ্য রাস্তায় তাহাদিগকে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি এবং নানা উপায়ে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। একদিন প্রাতে দেখা গেল স্কুল কমিটির এক সদস্যের বাড়ীর সম্মুখে রাতারাতি একটি প্রকাণ্ড নালা কাটিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই সব উৎপাত সহ্য করিয়াও স্কুলটি টিকিয়াছিল। অন্যান্য স্থানেও বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাগণকে বহু নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল।[১১]

১৮৪৯ সনের ৭ই মে তারিখে বেথুন সাহেব (**J. E. D. Bethune**) কর্তৃক **Hindu Female School** বা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইহাই বেথুন কলেজ নামে অদ্যাবধি স্ত্রীশিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ অনুষ্ঠান

বলিয়া পরিগণিত এবং শতাধিক বৎসর যাবৎ স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটিও বহু বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছিল। যাহাতে সম্ভ্রান্তঘরের কন্যারা এই হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে যোগদান করিতে পারে সেইজন্য প্রথম হইতেই কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। ভর্তি করার পূর্বে ছাত্রীদের কুলশীলের পরিচয় নেওয়া হইত। বাটী হইতে মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়া আসার জন্য ঘোড়ার গাড়ীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এরূপ নিয়ম করা হইয়াছিল যে, যে পর্যন্ত মেয়েরা বিদ্যালয়ে থাকিবে সে পর্যন্ত কোন পুরুষ তথায় যাইতে পারিবে না, এবং বিদ্যালয়ে খ্রীষ্টধর্মের কোন প্রসঙ্গ আলোচনা করা হইবে না। এই সমুদয় ব্যবস্থা সত্ত্বেও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি অনুরাগী ছিল না এবং ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হয়। প্রথমে ছাত্রীসংখ্যা ৬০টির বেশী হয় নাই। বেথুন সাহেবের মৃত্যুতে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ কষ্টকর হইলে বড়লাটের পত্নী লেডী ডালহৌসী ইহার ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ডালহৌসী ইহার খরচ দেন এবং তাঁহার সুপারিশে তাঁহার পদত্যাগের পরে ইহা সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

বেথুন স্কুলের সফলতার মূলে যে কয়জন বাঙ্গালী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরই বেথুন সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর অবৈতনিক সম্পাদক রূপে ইহার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি প্রগতিশীল ইয়ং বেঙ্গল দলের নেতারাও বেথুনকে খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রথম যে ২১ জন ছাত্রী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন তাঁহাদের মধ্যে মদন মোহনের দুই কন্যা ছিলেন। ইয়ং বেঙ্গল দল, ব্রাহ্মসমাজ ও ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি

ছাড়া গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান সমর্থন করিয়াছিলেন।[১২]

১৮৬২ সনের ১৫ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুল সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পাঠান তাহার সামান্য একটু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :[১৩]

"স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—লিখন-পঠন, পাটীগণিত, জীবন চরিত, ভূগোল, বাংলার ইতিহাস, নানা বিষয়ে মৌখিক পাঠ এবং সেলাইয়ের কাজ। বাংলা ভাষাতেই ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী, দুইজন সহকারী শিক্ষয়িত্রী এবং দুইজন পণ্ডিত এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করেন।··· ১৮৫৯ সাল হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা যেভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে কমিটি মনে করেন, যাহাদের উপকারের জন্য বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সমাজের সেই শ্রেণীর লোকের কাছে ইহার সমাদর ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে।" কিন্তু এই আশা ফলবতী হয় নাই। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার খুব ধীরে ধীরেই অগ্রসর হইয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ অবরোধ প্রথা, বাল্যবিবাহ এবং সর্বোপরি সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঔদাসীন্য। ইহাদের অনেকেই স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থনে বক্তৃতা দিতেন অথবা মুখে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন, কিন্তু মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাইতেন না এবং গৃহেও শিক্ষা দিতেন না। ফলে বেথুন স্কুলের অবস্থাও ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। ১৮৬৩ সনে উমেশ চন্দ্র দত্ত 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত করেন। ইহা নারীদের গদ্যে পদ্যে লিখিত অনেক রচনা প্রকাশ করিয়া এবং স্ত্রী-শিক্ষার সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়া ইহার উন্নতি বিধানে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। ১৮৬৮ সনে বামাবোধিনী পত্রিকায় নিম্ন-লিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয় : "আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে এ দেশের সর্বপ্রধান বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে এক্ষণে ৩০টি মাত্র ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' সংবাদপত্র লিখিয়াছে,

যে এই বিদ্যালয় উনিশ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে গভর্নমেণ্টের ইহার শিক্ষার কার্যে এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাত শত ছিয়াত্তর টাকা ব্যয় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহার সংস্থাপক এককালে ষাট হাজার টাকা দান করেন এবং প্রতি তিন বৎসর অন্তর বাটির সংস্কারকার্যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়। এরূপ প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া যখন শুধু ৩০টী মাত্র সাত আট বৎসর বালিকার সামান্য শিক্ষালাভ হইতেছে, তখন ইহাতে অর্থের কেবল অপব্যয় হইতেছে বলিতে হইবে।"[১৪]

এই মন্তব্য যথার্থ হইলেও কালের পরিবর্তনে এই বেথুন স্কুল-রূপ ক্ষুদ্র চারাটি যে মহামহীরূহে পরিণত হইয়া বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার সাধন করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই কার্য যে কিরূপ দুরূহ ছিল উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে তাহা বোঝা যায়। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের একটি প্রধান বাধা ছিল উপযুক্ত হিন্দু শিক্ষয়িত্রীর অভাব। মিস্ মেরী কার্পেণ্টার ১৮৬৬ সালে কলিকাতায় আসেন এবং তাঁহার সাক্ষাতে ব্রাহ্মসমাজ বাটিতে এক সভায় এই বিষয়টি আলোচিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি এই আলোচনায় যোগ দেন, এবং ইহার ফলে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে স্ত্রী-শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য একটি নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করা হউক। কিন্তু এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সাফল্য সম্বন্ধে অনেকের মনেই সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় (৩ পৌষ ১২৭৩) একজন লিখিলেন: "নর্মাল বিদ্যালয়ে কাহারা শিক্ষা করিবেন? এ দেশীয় বিধবাগণ? আমরা বলিতেছি শিক্ষকের সংখ্যা অতি অল্প হইবে। উচ্চ জাতির প্রায় কোন বিধবা আসিবেন না। ঢাকায় একটি নর্মাল বিদ্যালয় হইয়াছে, কিন্তু তথায় প্রায় বৈষ্ণবীর সংখ্যা অধিক। আমরা ইঁহাদিগের অবমাননা করিতেছি না, কিন্তু

বলিতেছি, বৈষ্ণবীদিগের উপরে সর্বসাধারণের ভক্তি অতি অল্প। এ অভক্তির বিশেষ কারণ আছে, এবং লোকে এ শ্রেণীর শিক্ষকের নিকটে যদি কন্যাগণকে না পাঠান তাহা হইলে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নয়।”[১৫]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ বাটির সভায় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেও পরে ইহাব সহিত লিপ্ত থাকিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ইহার কারণ তিনি বাংলার ছোট লাটকে লিখিত একখানি পত্রে (১লা অক্টোবর, ১৮৬৭) নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করেন :

“আমাদের দেশের হিন্দু সমাজের গ্রহণযোগ্য একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত কবিবার জন্য মিস্ কার্পেণ্টারের প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা কঠিন। এ দেশের ভদ্র পরিবারের হিন্দুরা যখন অবরোধপ্রথার গোঁড়ামির জন্য দশ-এগার বছরের বিবাহিত বালিকাদেরই গৃহের বাহিরে যাইতে দেয় না, তখন তাহারা যে বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করিতে সম্মতি দিবে এ আশা দুরাশা মাত্র। বাকী থাকে অনাথা বিধবারা—কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে তাহারা যদি অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহিরে সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে তাহা হইলে লোকের কাছে অবিশ্বাসের পাত্রী হইয়া উঠিবে এবং তাহার ফলে এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

“মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী যে কত আবশ্যক ও অভিপ্রেত তাহা আমি বিশেষভাবে জানি। দেশবাসীর দৃঢ়মূল সামাজিক কুসংস্কার যদি দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হইয়া না দাঁড়াইত তাহা হইলে সকলের আগে আমি ইহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। কিন্তু যে কার্যে সফলতার কোন সম্ভাবনা নাই তাহা আমি নিজেও যেমন সমর্থন করি না তেমনি সরকারকেও তাহা করিতে পরামর্শ দিতে পারি না।”[১৬]

বিধবা-বিবাহের পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টায় বিদ্যাসাগরের যে মনোবৃত্তির পরিচয় পাই ইহার সহিত তাহার সামঞ্জস্য করা কঠিন।[১৭] এ বিষয়ে 'সোমপ্রকাশ'-এর সম্পাদক যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা অনুধাবনযোগ্য। উক্ত পত্রিকায় পূর্বোক্ত প্রকাশিত পত্র সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন :

"পত্র প্রেরক বলেন, এখনও সময় হয় নাই, এবং ভদ্র কুলাঙ্গনারা তথায় অধ্যয়ন করিতে যাইবেন না। এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। কোন বিষয়ের নূতন অনুষ্ঠান হইলে সচরাচর এই প্রকার আপত্তি হইয়া থাকে।... অগ্রে স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, সময় হইয়াছে কিনা তাহার পর বুঝা যাইবে। আমরা যেমন দেখিতেছি, ভদ্র কুলাঙ্গনারা ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বিনী হইয়া সাহেব-বিবিদিগের সহিত একত্র পান ভোজনাদি করিতেছেন, তখন যে তাঁহারা স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইবেন না, কিরূপে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয়।"[১৮]

গভর্নমেণ্টও এই প্রকার মতের সমর্থন করিলেন এবং স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু তিন বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই নর্মাল স্কুল বন্ধ হইয়া গেল। বিদ্যাসাগরের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল।

উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব ব্যতীত, স্ত্রীলোকের বাল্য-বিবাহ, অবরোধপ্রথা, এবং স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে পুরুষের ঔদাসীন্য—এই তিনটিই ছিল স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের গুরুতর বাধা। নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ এবং বিশেষতঃ ইহার যুবক সভ্যদল এবং তাহাদের নেতা কেশবচন্দ্র সেন এই চারিটি বাধাই দূর করিবার চেষ্টা করেন, এবং স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। অবরোধ-প্রথা সে যুগে কতদূর কঠোর ছিল এবং কেশবচন্দ্র সেন কিরূপ দৃঢ়তার সহিত ইহা দূর করিয়া এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন, নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে সে বিষয়ে কিছু ধারণা করা যাইবে।[১৯]

ব্রাহ্মসমাজ অবরোধপ্রথার বিরোধী হইলেও প্রগতিশীল যুবক ব্রাহ্মেরা স্ত্রী বা পরিবারের মহিলাদের লইয়া প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইতেন না, বা সভা-সমিতিতে যোগদান করিতেন না। কেশবচন্দ্র সেন এই সমাজের আচার্য পদে নিযুক্ত হন এবং এই পদে অভিষেকের উৎসবে সস্ত্রীক জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে যাইবেন এরূপ মনস্থ করেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য ও অন্যান্য বহু আত্মীয়-স্বজন ইহাতে বাধা দানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া ভোজপুরী দরওয়ান ও অন্যান্য ভৃত্যকে বাধা দিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন এবং নিজেরা সকলে সমবেত হইলেন। কেশবচন্দ্র স্থানীয় পুলিশ ইন্‌স্পেক্‌টরকে সাহায্য করিবার জন্য চিঠি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু পুলিশ আসিবার পূর্বেই ধীরপদক্ষেপে, দৃঢ়চিত্তে পঞ্চদশ বর্ষীয়া অবগুণ্ঠিতা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া, আত্মীয়-স্বজনের ব্যূহ ভেদ করিয়া দরজার নিকট আসিলেন এবং দরজার হুড়কা খুলিতে আদেশ দিলেন। দরজা খুলিয়া গেল এবং কেশবচন্দ্র সস্ত্রীক জোড়াসাঁকোর উৎসবে যোগদান করিলেন। কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যার পূর্বেই তিনি সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের স্বাক্ষরিত এক পত্র পাইলেন যে, কলুটোলার যে পৈতৃক ভবন হইতে তিনি সকালে যাত্রা করিয়াছিলেন সেখানে আর তাঁহার স্থান হইবে না। এই বিপদে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার নিজ ভবনে কেশবচন্দ্রকে আশ্রয় দিলেন এবং কেশবচন্দ্র দীর্ঘকাল তথায় ছিলেন। এই ঘটনার তারিখ—১৮৬২ সনের ১৩ই এপ্রিল—বাংলায় অবরোধপ্রথা দূরীকরণের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন।

এই ঘটনার পূর্ব হইতেই কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগী নব্য যুবক ব্রাহ্মদল নিজ নিজ স্ত্রীকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অন্যান্য উপায়েও কেশবচন্দ্র স্ত্রীজাতির উন্নতিবিধানে যত্নবান ছিলেন। ১৮৭২ সনে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি একটি

স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সরকারী সাহায্য পাইলেন। ইহাতে স্ত্রী-শিক্ষার অনেক উন্নতি হইল। কেশবচন্দ্র নিজে, ধর্মজগতে প্রসিদ্ধ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ের কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ 'বামা-হিতৈষিণী সভা' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সমাজের অনেক গণ্যমান্য মহিলারাও ইহাতে যোগদান করিয়া নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং কিরূপে তাহারা কন্যা, গৃহিণী ও মাতার উচ্চ আদর্শ পালন করিতে পারে তাহার আলোচনা করিতেন। এই সময়ে 'অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা' নামে আর একটি সভা স্থাপিত হয় এবং ইহার প্রচেষ্টায় অন্তঃপুর-বাসিনী স্ত্রীলোকের, অর্থাৎ বালিকা, বধূ, প্রবীণা, সকলের, শিক্ষাদান ও পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। প্রশ্নপত্র পাঠাইয়া দেওয়া হইত এবং ঢাকা, রাজসাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান হইতে ছাত্রীরা উত্তর-পত্র পাঠাইত। পরীক্ষার ফল অনুসারে তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইত। প্রধানতঃ কয়েকজন ব্রাহ্মনেতার চেষ্টায় ১৮৭৮ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইল। ইহার পর হইতেই স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা মন্থর গতিতে হইলেও ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইল। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষের ন্যায় নারীকে শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে কেবল প্রাচীনপন্থী হিন্দুগণ নহে, ব্রাহ্মসমাজের অনেকেও ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে (চৈত্র ১৮০২ শকাব্দ) নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইল : "স্ত্রী ও পুরুষ জাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার নিমিত্ত দুইয়ের পক্ষে এক প্রকার শিক্ষার উপযোগিতা অসম্ভব। স্ত্রী-প্রকৃতি স্বভাবতঃ হৃদয়-প্রধান এবং পুরুষ-প্রকৃতি প্রধানতঃ বুদ্ধি-প্রধান। অতএব তাহাকেই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা বলা যাইতে পারে, যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ের

উন্নতি এবং গৌণ উদ্দেশ্য বুদ্ধির উন্নতি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ, এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা বুদ্ধি-প্রধান শিক্ষা, হৃদয়-প্রধান শিক্ষা নহে; অতএব ঐ প্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে।"

বর্তমান কালেও এই প্রকার আপত্তি মাঝে মাঝে শোনা যায়, এবং ইহার যৌক্তিকতা বিচার বর্তমান প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। কিন্তু কার্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষাই যে সমাজে মেয়েদের জন্যও গৃহীত হইয়াছে, বর্তমান কালে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ক্রমবর্ধমান ছাত্রীসংখ্যাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সে যুগেও যে ইহার বহু সমর্থক ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় কবিতায়। ১৮৮৩ সনে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু বি. এ. পরীক্ষা পাশ করেন। প্রথম দুই বঙ্গনারীর এই কৃতিত্ব উপলক্ষে কবিতাটি রচিত হয়। ইহার শেষ কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিতেছি—

"হরিণ-নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
শুন ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা,
যে ধিক্কারে লিখিয়াছি "বাঙ্গালীর মেয়ে",[২০]
তারি মত সুখ আজি তোমা দোঁহে পেয়ে॥
বেঁচে থাক, সুখে থাক, চিরসুখে আর
কে বলেরে বাঙ্গালীর জীবন অসার।
কি আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে?
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে।
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।"

হিন্দু সমাজে মধ্যযুগে নারীজাতির যে সমুদয় দুর্গতি ঘটিয়াছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাহার অনেকটাই দূর হইয়াছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই উন্নতির

সূচনা দেখা দিলেও কার্যতঃ শিক্ষার প্রসার ও সতীদাহ নিবারণ ব্যতীত আর কোন বিষয়ে ইহা খুব বেশী অগ্রসর হয় নাই।

সতীদাহ-প্রথার প্রাচীনতা ও মধ্যযুগে তাহার প্রসারের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বঙ্গদেশে ব্রিটিশ-শাসন প্রবর্তিত হইলে ওয়ারেন হেস্টিংস কয়েকজন ব্রাহ্মণের সাহায্যে হিন্দু আইন সঙ্কলন করেন। ইহাতে সতী-প্রথার মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে—উক্ত হইয়াছে যে, "পতির চিতায় পুড়িয়া মরিলে সাধ্বী সতী সাড়ে তিন কোটি বছর পতিসহ সুখে স্বর্গে বাস করিবে এবং তাহার পতির পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলের তিন পুরুষ পাপ মুক্ত হইবে। সহমরণে যাওয়ার ন্যায় পত্নীর আর কোন মহৎ কর্তব্য নাই এবং জন্ম জন্ম ইহা অবহেলা করিলে তাহার পশু জন্ম হইবে।" ইংরেজ গভর্নমেণ্ট, হিন্দুর ধর্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না এই সাধারণ নীতি অনুসরণ করার ফলে, শাস্ত্রের এই বিধি অমান্য করিয়া সতী-প্রথা রহিত করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু কলিকাতার সুপ্রীম কোর্ট তাহাদের অধিকারের সীমার মধ্যে ইহা দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষণা করায় কলিকাতার অধিবাসীরা কলিকাতা শহরের বাহিরে যাইয়া এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিত। ডেন, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি বণিক সম্প্রদায়ের এলাকায়ও সতী-প্রথা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু সেখানকার লোকেরাও উহার সীমানার বাহিরে যাইয়াই সহমরণ অনুষ্ঠান করিত।

ইংরেজ গভর্নমেণ্টের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি সত্ত্বেও কয়েকজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ১৭৯৭ খ্রীঃ মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট লেখেন যে তিনি কোনমতে একটি নয় বৎসর বয়সের বালবিধবাকে আপাততঃ সহমরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন—কিন্তু সম্ভবতঃ সরকারী আদেশ জারি না করিলে ইহা বন্ধ করা যাইবে না। অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটরাও এইরূপ রিপোর্ট করেন।

কিন্তু গভর্নমেণ্ট তাহার উত্তরে বলেন যে উপদেশ দিয়া নিবৃত্ত করা ছাড়া তাঁহারা যেন আর কোন উপায় অবলম্বন না করেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ নদীয়ার এক কুলীন ব্রাহ্মণের ২২টি স্ত্রী তাহার সহিত সহমৃতা হয়। ঐ সময়েই শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী সুকচরা গ্রামে এক কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। তাহার ৪০টি পত্নীর মধ্যে যে ১৮টি জীবিত ছিল সকলেই সহমৃতা হয়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজার হইতে গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে যে প্রায় ৭০টি বিধবা সহমৃতা হইয়াছিল তাহার একটি তালিকা পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ হইতে আরম্ভ করিয়া কামার, কুমার, তেলী, ছুতার, স্বর্ণকার, কৈবর্ত, ধোপা, নাপিত, তাঁতী, বাগ্দী প্রভৃতি সব জাতির বিধবাই আছে এবং তাহাদের বয়স ১০ হইতে ৬০ বৎসর। ১৮১৩ সনে একটি সরকারী আদেশ জারি হয় যে মাদক দ্রব্য দ্বারা বিধবাকে অজ্ঞান করিয়া এবং গর্ভিণী বা ঋতুমতী হইবার পূর্বে কোন বালবিধবার সহমরণ ম্যাজিস্ট্রেট রহিত করিতে পারিবেন। ১৮১৭ সনে আদেশ হয়, যে যে-সব বিধবার স্তন্যপায়ী শিশু অথবা সাত বৎসরের ছোট সন্তান আছে অথচ তাহাদের পালন করার আর কেহ নাই—তাহারা সহমৃতা হইতে পারিবে না এবং সহমরণের পূর্বে অভিভাবকেরা পুলিশকে না জানাইলে দণ্ডনীয় হইবেন। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। ১৮১৮ হইতে ১৮২৮ সনের মধ্যে কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, বেনারস ও বেরিলী এই ছয় বিভাগে গড়ে প্রতি বৎসর ছয় শতেরও বেশী বিধবা সহমৃতা হইত। বাংলাদেশে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা সহমরণ বেশী হইত।

ইতিমধ্যে বহু ইংরেজ কর্মচারী, ও খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণ এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ গভর্নমেণ্টকে লিখিতে লাগিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং উদারভাবাপন্ন বাঙ্গালীরাও ক্রমে ক্রমে প্রাচীন সংস্কারের বন্ধনমুক্ত হইয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

১৮১৫ ও ১৮১৭ সনে সতীপ্রথার নিয়ন্ত্রণ ও পূর্বোক্ত দুইটি রাজশাসন রহিত করিবার জন্য যখন হিন্দুরা গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করেন তখন রামমোহন রায় এবং তাঁহার বন্ধু ও সহযোগিগণ ইহার বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্টের নিকট পাল্টা আবেদন করেন (১৮১৮ খ্রীঃ)। এই সময় হইতে রামমোহন রায় সতীপ্রথার বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন করেন ও শ্মশান ঘাটে যাইয়া সহমরণার্থী বিধবাগণকে অনেক প্রকারে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। হিন্দুশাস্ত্রে যে বিধবাদের সহমরণে যাইতে হইবে এইরূপ কোন নির্দেশ বা বিধান নাই ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' এই নাম দিয়া ১৮১৮ ও ১৮১৯ খ্রীঃ দুইখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে দুই ব্যক্তির কথোপকথনচ্ছলে সহমরণের সপক্ষে ও বিপক্ষের যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। ১৮২৯ খ্রীঃ তিনি সহমরণ বিষয়ে আর একখানি গ্রন্থ লেখেন।

ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন খুব তীব্র হইয়া ওঠে। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে দুইটি পৃথক দল ছিল। একদলের অভিমত ছিল এই যে সরাসরি আইন করিয়া এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করা হউক। আর এক দলের ইহাতে আপত্তি ছিল—এবং তাঁহাদের মতে এ বিষয়ে আন্দোলনের ফলেই ক্রমে ক্রমে লোকেরা এই প্রথার নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করিবে এবং আপনা হইতেই এই প্রথা রহিত হইবে। রামমোহন রায় এই শেষোক্ত দলে ছিলেন এবং লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যখন অনেক ইতস্ততের পর সতীপ্রথা নিষেধের আইন জারি করা স্থির করিয়া রামমোহনের সহিত পরামর্শ করেন, তখন রামমোহন ইহার অনুমোদন করেন নাই। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে বিদেশী গভর্নমেণ্ট আইন দ্বারা হিন্দু সমাজের ব্যবস্থা করিবেন ইহা সাধারণ নীতি হিসাবে গ্রহণ করিতে রামমোহন অনিচ্ছুক ছিলেন। রামমোহনের

পরে অনেক উদারপন্থী হিন্দু নেতারাও অনুরূপ কারণে বিধবা-বিবাহ, বহু-বিবাহ প্রভৃতি রহিত করিবার জন্য আইনের আশ্রয় লওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। কিন্তু রামমোহন বেণ্টিঙ্ককে পরামর্শ দিলেন যে, আইন না করিয়া এই অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে নানা বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া পুলিশের সাহায্যেই ইহা রহিত করা সম্ভব হইবে। লর্ড বেণ্টিঙ্কের পূর্ববর্তী কোন বড়লাট সহমরণ-নিষেধসূচক আইন করিতে সম্মত হন নাই। হিন্দুধর্মের ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে সাধারণ নীতি ছাড়াও তাঁহাদের আশঙ্কা ছিল যে ইহাতে হিন্দু জনসাধারণ এবং বিশেষতঃ দেশীয় সৈন্য বিদ্রোহ করিতে পারে। বেণ্টিঙ্ক সামরিক কর্মচারী ও অন্যান্য অনেকের সঙ্গে আলোচনা করিয়া এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন, এবং ১৮২৯ সনে ৪ঠা ডিসেম্বর এক আইন পাশ করিয়া সতীদাহ-প্রথা দণ্ডনীয় ঘোষণা করিলেন।[২১]

এই আইন পাশ হওয়া মাত্রই প্রাচীনপন্থী হিন্দুগণ ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। বহু উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী হিন্দু এই বিরুদ্ধ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, মহারাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর বাহাদুর, গোপীমোহন দেব প্রভৃতি। ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা নিবাসী ৮০০ লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদনে গভর্নমেণ্টকে সতীপ্রথা-নিষেধ-বিধি প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করা হইল। সতীপ্রথার সমর্থনে ১২০ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণযুক্ত একখানি ক্রোড়পত্র এই আবেদনের সঙ্গে পাঠান হইয়াছিল। কলিকাতার নিকটবর্তী বেলঘরিয়া, আরিয়াদহ প্রভৃতি স্থানের নিবাসী ৩৪৬ জনের স্বাক্ষরিত অনুরূপ আর একখানি আবেদন পত্রও গভর্নমেণ্টের নিকট পাঠান হইল।

রামমোহন রায় আইনের দ্বারা সহমরণ রহিত করায় আপত্তি করিলেও এই আইন পাশ হইবার পর তাহার পুরাপুরি সমর্থন

করিলেন। প্রাচীনপন্থীদের প্রতিবাদের উত্তরে কলিকাতার ৩০০ হিন্দু ও ৮০০ খ্রীষ্টান অধিবাসীর স্বাক্ষরিত একখানি অভিনন্দন পত্র বড়লাটকে দিবার জন্য রামমোহন রায়, কালীনাথ চৌধুরী প্রভৃতি ১৬ই জানুয়ারী (১৮৩০) বড়লাট ভবনে উপস্থিত হন। বাংলায় লেখা অভিনন্দনখানি ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করা হয়। এই অভিনন্দন পত্রে উক্ত দুইজন ব্যতীত দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির স্বাক্ষর ছিল। অনেকের বিশ্বাস যে রামমোহন রায়ই এই অভিনন্দন পত্র রচনা করেন। ইহার মর্মার্থ এই যে, হিন্দুপ্রধানেরা আপন আপন স্ত্রীর প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া যাহাতে বিধবারা কোনক্রমে অন্যাসক্ত না হয় তাহার জন্য সজীব বিধবাদের দগ্ধ করার রীতি প্রচলন করেন; কিন্তু নিজেদের এই গর্হিত কর্ম নির্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রের বচন পাঠ করিতেন।

এই অভিনন্দন পত্রেই সতীদাহের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে বিধবাদের আত্মীয় অন্তরঙ্গেরা এই বিহ্বলাদের দাহকালীন তাহাদিগকে প্রায় বন্ধন করিতেন এবং যাহাতে তাহারা চিতা হইতে পলাইতে না পারে এ নিমিত্ত রাশীকৃত তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা তাহাদের গাত্র আচ্ছন্ন করিতেন।[২২]

এই উক্তিটি অনেকে অতিরঞ্জন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ১৮২৭ খ্রীঃ ৫ই মে তারিখে 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত একখানি পত্রে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণেও ইহার উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন—"গরিফা গ্রামে ২২শে বৈশাখে ২২ বৎসর বয়স্কা এক ব্রাহ্মণের কন্যা সতী হইয়াছে। সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় হস্তধারণপূর্বক ঘূর্ণপাকে সাত বার ঘুরাইয়া শীঘ্র চিতারোহণ করাইয়া শবের সহিত দৃঢ় বন্ধন পুরঃসরে জ্বলদগ্নিতে দগ্ধকরণ ও বংশদ্বয় দ্বারা শবের সহিত তাহার শরীর দাবিয়া রাখন ও তাহার কথা কেহ শুনিতে না পায় এ

নিমিত্তে গোলমাল ধ্বনি করণ অতি দুরাচার নির্মায়িক মনুষ্যের কর্ম।"[২৩]

বেণ্টিঙ্ক প্রাচীনপন্থিগণের আবেদন অগ্রাহ্য করিলে তাহারা বিলাতে সপারিষদ রাজার (King-in-Council) নিকট আপীল করেন। রামমোহন ইহার বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক সম্বলিত একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং উক্ত আপীলের প্রতিবাদে আর একখানি আবেদন রচনা করেন। তিনি ইহা নিজে সঙ্গে করিয়া বিলাতে লইয়া যান এবং Commons সভায় দেন। বিলাতে প্রিভি কাউন্সিল যখন প্রাচীনপন্থীদের আপীল বরখাস্ত করেন তখন রামমোহন উপস্থিত ছিলেন। এইরূপে সতীদাহ আন্দোলনের উপর যবনিকাপাত হইল এবং একটি নিষ্ঠুর প্রথা চিরকালের জন্য রহিত হইল।

সতীপ্রথা রহিত হওয়ায় এবং ব্রাহ্মসমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়ায় হিন্দুসমাজেও বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের সপক্ষে আন্দোলন আরম্ভ হয়। ইহার ফলে ১৮৩৭ সনে ভারতীয় আইন কমিশন কলিকাতা, এলাহাবাদ ও মাদ্রাজের সদর আদালতের বিচারকদিগকে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেন—কিন্তু সকলেই বাল-বিধবার পুনর্বিবাহ সমর্থন করিলেও ইহার জন্য আইন করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ইহার পর এ বিষয়ে দুই বিরোধী দলের মধ্যে বহু বাদানুবাদ হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজা রাজবল্লভ বিধবা-বিবাহের পুনঃ প্রবর্তনের চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিকূলতায় ইহা ব্যর্থ হয়—ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ইহার শতবর্ষ পরে কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর রাজা শ্রীশচন্দ্র, রাজবল্লভের অনুকরণে বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্রসিদ্ধ ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য স্মার্ত পণ্ডিতগণের নিকট হইতে একটি ব্যবস্থা-পত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেন। অনেক পণ্ডিত ইহা স্বাক্ষর করিতে রাজী হইলেন, কিন্তু

তাঁহাদের ভয় হইল যে এরূপ মত ব্যক্ত করিলে সমাজে তাঁহারা 'এক-ঘরে' হইবেন এবং বিবাহ-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ বন্ধ হইবে। কেহ কেহ পরিষ্কার বলিলেন যে মহারাজা যদি চিরদিনের মত জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারেন তবে তাঁহারা ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন। শ্রীশচন্দ্র ইহাতে অসম্মত বা অসমর্থ হওয়ায় পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন নাই। কলিকাতার বহুবাজার অঞ্চলের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য কয়েকজন দলবদ্ধ হইয়া এ বিষয়ে চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থকাম হন। পটল-ডাঙ্গা নিবাসী শ্যামাচরণ দাস তাঁহার বাল-বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন। অনেক পণ্ডিত এক ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করেন কিন্তু পরে তাঁহারাই বিরোধিতা করেন। ১৮৪৫ খ্রীঃ **British India Society** বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে 'ধর্মসভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী' সভার সহিত আলোচনা করে; কিন্তু কোন সভাই কোন উৎসাহ দেখায় নাই। এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি বিধবা-বিবাহ সমর্থনকল্পে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ১৭৭৬ শকের ফাল্গুন মাসে (১৮৫৪ সনে) 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। ইহার ফলে বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে আন্দোলন খুব তীব্র আকার ধারণ করে। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিপক্ষ পণ্ডিতগণের যুক্তি খণ্ডন করিয়া বিধবা-বিবাহের সমর্থনে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত করেন। ইহাতে আন্দোলন সর্বশ্রেণীর মধ্যে বিস্তৃত হয়। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নানা ছন্দে কবিতা রচনা করেন। ইহা ছাড়াও পথে-ঘাটে সুন্দর সুন্দর ছড়া, গান ও কবিতা লোকের মুখে মুখে ফিরিত। শান্তিপুরের তাঁতিরা বিদ্যাসাগরপেড়ে শাড়ী প্রস্তুত করিয়া চড়া দামে বিক্রয় করিত। ইহার পাড়ের উপর যে গানটি লেখা ছিল তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি।

"বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হয়ে,
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।
আর কেন ভাবিস লো সই ঈশ্বর দিয়াছেন সই,
এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতি প্রাপ্ত হই।
রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন নাকো সই।"

সহমরণ বিষয়ে রামমোহনের ন্যায় বিদ্যাসাগরও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বিধবা-বিবাহ সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর হৃদয়-বৃত্তির কাছে মর্ম্মস্পর্শী আবেদন করেন। কিন্তু কেবলমাত্র ইহার উপর নির্ভর না করিয়া তিনি বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য রাষ্ট্রীয় বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৫ সনের ৪ঠা অক্টোবর তিনি হিন্দু সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন স্তরের ৯৮৭ জনের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন-পত্র ভারত সরকারে প্রেরণ করেন। ইহাতে বলা হয় যে দেশাচার অনুসারে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু এই নিষেধ শাস্ত্রসঙ্গত নহে। আবেদনকারীরা মনে করেন, শাস্ত্রের অপব্যাখ্যার জন্য যে সামাজিক বাধা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে ব্যবস্থাপক সভার কর্তব্য তাহা অপসারণ করা।

১৮৫৫ সনের ১৭ই নভেম্বর ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা-বিবাহ আইনের খসড়া পেশ করা হইলে ভারতের সর্বত্র ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব ইহার বিরুদ্ধে প্রায় ৩৭,০০০ লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পত্র ভারত সরকারে প্রেরণ করেন। নবদ্বীপ, ত্রিবেণী, ভট্টপল্লী (ভাটপাড়া) প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের পক্ষ হইতেও বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আবেদন পত্র পাঠানো হয়। অপর পক্ষে বাংলা দেশের বহু স্থান হইতে বিধবা-বিবাহ আইনের সমর্থনে আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। অবশেষে বহু আন্দোলন ও তর্ক-বিতর্কের পর ১৮৫৬ সনের ২৬শে জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হইল।

এই আন্দোলনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর যে সংকল্প ও চরিত্রের দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়কর। তিনি গালাগালি, নানাপ্রকার অপমান এবং নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন, তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রেও ভীত হন নাই। সমসাময়িক 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা যথার্থই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "তাঁহার অদ্বিতীয় নাম এই অসাধারণ কীর্তির সহিত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাকিবে। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, অদ্বিতীয় তিতিক্ষা ও তুলনারহিত ধীশক্তিই এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইবার প্রতি প্রধান কারণ।" স্ত্রী-শিক্ষা ব্যাপারে দেখা গিয়াছে যে সমাজের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মুখে ইহার সমর্থন করিলেও কার্যতঃ তাহা করেন নাই। কিন্তু এ বিষয়েও বিদ্যাসাগর আদর্শস্থানীয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র বিধবা-বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে বিদ্যাসাগরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লেখেন যে. এই বিবাহ হইলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আমাদের সহিত আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব ইহা নিবারণ করা আবশ্যক। উত্তরে বিদ্যাসাগর লেখেন—"আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্তক; আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি; এমন স্থলে আমার পুত্র স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।" তাহার পর বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন: "বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ব-বিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা।[২৪]

বিধবা-বিবাহ ছাড়া বিদ্যাসাগর আর একটি সামাজিক সংস্কারের চেষ্টা করেন। কুলীন ব্রাহ্মণদের বহু বিবাহ ও তজ্জনিত অনূঢ়া ও বিবাহিতা কুলীন কন্যাদের দুরবস্থার কথা পূর্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি।

১৮৩৬ সনের ২৩শে এপ্রিল তারিখের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি পত্রে ২৭ জন ব্রাহ্মণের নাম, ধাম ও স্ত্রীর সংখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৩ জনের স্ত্রীর সংখ্যা ৬০ বা ততোধিক, ৩ জনের ৫০ হইতে ৬০, ২ জনের যথাক্রমে ৪৭ ও ৪০, ২ জনের যথাক্রমে ৩৪ ও ৩৭, ৭ জনের ২০ হইতে ৩০, ৯ জনের ১০ হইতে ২০, ও একজনের মাত্র ৮। আমার বাল্যকালে আমাদের গ্রামের দুই কুলীন ভ্রাতার প্রত্যেকের স্ত্রীর সংখ্যা ছিল ৫০ হইতে ৬০। সুতরাং উনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথমেও এই কুপ্রথার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। বিদ্যাসাগর 'বহু-বিবাহ' নামক পুস্তকে এই প্রথার তীব্র নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন, "এ দেশের ভঙ্গ কুলীনদের মত পাষণ্ড ও পাতকী ভূমণ্ডলে নাই। তাঁহারা দয়া, ধর্ম, চক্ষুলজ্জা ও লোকলজ্জায় একেবারে বর্জিত।" বাংলা দেশের নব্য সম্প্রদায় সতীপ্রথার ন্যায় বহু-বিবাহের বিরুদ্ধেও আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ সনে 'বন্ধুবর্গ সমবায়' বা 'সুহৃদ্ সমিতি' নামক সভা হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বহু-বিবাহ নিবারণের জন্য একটি আবেদন পত্র পাঠানো হয়।

ইহার অল্পকাল পরেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারত সরকারের নিকট এ বিষয়ে আবেদন করেন এবং ইহার পরে বাংলাদেশ হইতে কয়েক হাজার লোকের স্বাক্ষরিত ১২৭ খানি আবেদন পত্র ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ করা সঙ্গত কিনা ইহা লইয়া বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে মতভেদ হইল। অন্য দিকে, বাংলার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ বহু-বিবাহ সমর্থন করায় বিদ্যাসাগর তাঁহাদের মতামত, যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণের অসারতা প্রতিপাদনপূর্বক বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একখানি পুস্তক লেখেন। ইহার ফলে এই আন্দোলন বাংলা দেশের সর্বত্র বিস্তৃত হয়। এই প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নাম

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ ও প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোক হইলেও বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়া বক্তৃতা দেন, গ্রন্থ প্রকাশ করেন ও অনেক ছড়া ও গান রচনা করেন। সেগুলি বহুদিন লোকের মুখে মুখে ফিরিত। অন্যান্য অনেকেও এইরূপ ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। তাহার একটি উদ্ধৃত করিতেছি। যাহাতে তদানীন্তন বাংলার ছোট লাট ক্যাম্বেল রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা বহু-বিবাহ প্রথা রহিত করেন তজ্জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে অনুরোধ করিয়া এই লৌকিক গীতটি রচিত হইয়াছিল।

"কেম্বলকে মা মহারাণী কর রণে নিয়োজন।
(রাজা) বল্লালেরি চেলাদলে করিতে দমন।
কাজ নাই সিক সিফাইগণ, চাইনা গোলা বরিষণ,
(একটু) আইন অসি খরষাণ করগো অর্পণ,
বিদ্যাসাগর সেনাপতি
(মোদের) রাসবিহারী হবে রথী,
মোরা কুলীন যুবতী সেনা হব যে এখন।"[২৫]

১৮৫৫ সনে বিদ্যাসাগর ও বর্ধমানের মহারাজা বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ করিবার জন্য আইন সভায় আবেদন করেন। অপরদিকে রাধাকান্ত দেব ইহার সপক্ষে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। নানা কারণে বহুদিন ইহার আলোচনা স্থগিত থাকে এবং ১৮৬৬ সনে বাংলা গভর্নমেণ্ট এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য বাঙ্গালী ও ইংরেজ সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন। বিদ্যাসাগর ব্যতীত আর সকল বাঙ্গালী সদস্যই এ বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। বঙ্কিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই মতের সমর্থন করেন। সুতরাং গভর্নমেণ্ট এই বিষয়ে আইন করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহার পর বহু বর্ষ অতীত হইয়াছে। বিনা আইনে কুলীনের বহু-বিবাহ প্রথা রহিত

হইয়াছে। কিন্তু আইন করা সত্ত্বেও বিধবা-বিবাহ বিশেষ প্রচলিত হয় নাই।

বহু-বিবাহের ন্যায় বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধেও নব্যপন্থী হিন্দুরা আন্দোলন আরম্ভ করে। ১৮৮৪ সনে পার্শী বেহরামজী মেরবানজী মালাবারি একখানি বই লেখায় এ বিষয়ে সরকারের ও সাধারণের দৃষ্টি এই প্রথার কুফলের দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রাচীনপন্থীরা এ সম্বন্ধে কোন আইন করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও ঘোর আন্দোলন করেন। ১৮৮৯ সনে হরি মাইতি তাহার বালিকা স্ত্রী ফুলমণির সঙ্গে বলপূর্বক সহবাস করায় তাহার মৃত্যু হয়। ইহাতে বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে বাংলায় ও বাংলার বাহিরে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। কলিকাতার **Health Society** এবং ৫৫ জন স্ত্রীলোক-ডাক্তার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। অবশেষে প্রধানতঃ মালাবারির চেষ্টায় ১৮৯১ সনে সহবাস-সম্মতি বয়স সম্বন্ধে এক আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে ১২ বৎসরের কম বয়সের বালিকা বধূর সঙ্গে সহবাস করিলে স্বামী দণ্ডনীয় হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হয়।

বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষতঃ স্বাধীনতা লাভের পরে, বিবাহের ন্যূনতম বয়স-বৃদ্ধি, স্ত্রীলোকের বিবাহ-বিচ্ছেদের এবং পিতার ও স্বামীর ধন-সম্পত্তিতে অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে আইন পাশ হইয়াছে, এবং আরো নানা উপায়ে স্ত্রীলোকের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে ইহার সবিস্তার উল্লেখ অনাবশ্যক। তবে এইগুলি যে উনবিংশ শতাব্দীতে আরব্ধ ব্যাপক আন্দোলনেরই ফল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার ফলেই যে বর্তমান কালে বাঙ্গালী নারী, নিরক্ষরতা, বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ ও অবরোধ-প্রথা প্রভৃতি বহু দিনের সঞ্চিত লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত হইতে মুক্তিলাভ

করিয়াছে এবং স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পাইয়া ও নানাবিধ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উপযুক্ত মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে অনেক পরিমাণে সমর্থ হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং সর্ববিধ উন্নতির মূলস্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, হিন্দু সমাজের স্ত্রীলোকের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। স্ত্রীলোকের উন্নতি ও প্রগতি উনবিংশ শতাব্দীতেও কত বহুমুখী ছিল তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াই আমার এই বক্তৃতামালার উপসংহার করিব।

সাহিত্য ক্ষেত্রে বঙ্গ-নারীর দান অকিঞ্চিৎকর নহে। কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' তাঁহাকে বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। স্বর্ণকুমারী দেবী নিজে সুলেখিকা ছিলেন এবং তাঁহার সম্পাদনায় 'ভারতী' একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রে পরিণত হয়। নয় বৎসর (১২৯১-৯৯) সম্পাদনা কার্যের পর তিনি অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার দুই কন্যা হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী ইহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন ও যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করেন। বাংলার জাতীয় জাগরণে এই পত্রিকার ও সরলা দেবীর দান অবিস্মরণীয়। বহুকাল অবধি লুপ্ত নারীর সঙ্গীত শিল্পের চর্চাও ঠাকুর বাড়ীর কয়েকটি মহিলার কল্যাণে পুনরুজ্জীবিত হয়।

শিক্ষিতা নারীর মনে নানাভাবে নবজাগ্রত জাতীয়তার উন্মেষের পরিচয় পাওয়া যায়। অবলা দাস ছাত্রী অবস্থায় হিন্দু মেলায় কবিতা আবৃত্তি করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাদণ্ডে ছাত্রীরা কালো ফিতা পরিয়াছিল। বড়লাট লর্ড রিপনের অভ্যর্থনায় প্রায় ৩০।৪০টি ছাত্রী এক রকম পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইয়া রেল স্টেশনে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করে।

১৮৯০ সনে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় এবং

স্বর্ণকুমারী দেবী, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন বঙ্গ-মহিলা প্রতিনিধিরূপে এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কাদম্বিনী দেবী সাধারণ অধিবেশনে প্রায় পাঁচ হাজার দর্শকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা অ্যানি বেসাণ্ট *How India Wrought for Freedom* নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই সর্বপ্রথম একজন মহিলা কংগ্রেস প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা যে ভারতীয় নারীর মর্যাদা কতদূর উন্নত করিবে ইহা তাহারই প্রতীক। অ্যানি বেসাণ্টের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে।

পাদটীকা

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'রামমোহন রায়', পৃঃ ৭৪-৭৫।

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৬। (এই গ্রন্থ অতঃপর সং, সে, ক, নামে উল্লিখিত হইবে)

৩। ঐ, পৃঃ ১৮৭।

৪। W. Adam., Reports on Vernacular Education in Bengal and Bihar 1835, 1836 and 1838.

৫। ব্রজেন্দ্রনাথ—সং, সে, ক, ১ম খণ্ড পৃঃ ৪০৫।

৬। ঐ, পৃঃ ৪০৭।

৭। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জন্য *"History and Culture of the Indian People"* (Bombay) Vol. X, pp. 285 ff. দ্রষ্টব্য।

৮। ব্রজেন্দ্রনাথ—সং, সে, ক—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩-১৫; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৭; তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২১।

৯। বিনয় ঘোষ—বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২৫-১২৮।

১০। ঐ, পৃঃ ১২৮।

১১। The *Calcutta Review*, 1855, p. 79.

১২। সং, সে, ক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৫। গৌরীশঙ্করের মতামত পূর্বেও উল্লিখিত হইয়াছে।

১৩। বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর, পৃঃ ১৩৮-৩৯—এই রিপোর্টের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৪। ঐ, পৃঃ ১৪২-৩।

১৫। ঐ, পৃঃ ১৪৭।

১৬। ঐ, পৃঃ ১৪৮-৯।

১৭। সম্ভবতঃ বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের তিক্ত অভিজ্ঞতাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ মত পরিবর্তনের কারণ।

১৮। বিনয় ঘোষ—বিদ্যাসাগর, পৃঃ ১৪৭।

১৯। বিস্তৃত বিবরণের জন্য ইংরেজীতে লিখিত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিরচিত কেশবচন্দ্রের জীবনী (৯০-৯২ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

২০। এই ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় হেমচন্দ্র বঙ্গরমণীর বহু নিন্দা করিয়াছিলেন।

২১। সতীদাহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য।

(ক) *History and Culture of the Indian People* (Bombay), Vol. X, pp. 268-275 (খ) *Education and Social Amelioration of Women in Pre-Mutiny India* by Kalikinkar Dutta, pp. 63-126 and Appendix, pp. i—xxi.

২২। সং, সে, ক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৮-৯।

২৩। ঐ, পৃঃ ১৪৭।

২৪। বিনয় ঘোষ—বিদ্যাসাগর, পৃঃ ১৬০-৬১। এই গ্রন্থের ১৬০-২৩০ পৃষ্ঠায় বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

২৫। বিনয় ঘোষ—বিদ্যাসাগর, পৃঃ ২৫৮। এই গ্রন্থের ২৩১-২৬২ পৃষ্ঠায় বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

নির্দেশিকা

অন্নদামঙ্গল ২
অনসূয়া ১১৩
অনুলক্ষ্মী ৬২
অপরার্কের টীকা ৭৪
অবরোধ প্রথা ৭২, ৯৮, ৯৯, ১৩৬
অবলা দাস ১৩৭
অর্থশাস্ত্র ৭৩
'অসহায়' ৬১
অহল্যাবাঈ ৮৪
অ্যাডাম (Adam) ১০৮
অ্যানি বেসান্ট ১৩৮
আঙ্গিরস ৭০
আত্রেয়ী ৫৮
আপস্তম্ব ৯২
আমহার্স্ট (লেডী) ১১১
আলবুকার্ক ৮৫
আলালের ঘরের দুলাল ২৪, ২৫
আলিবর্দী ৮৮
আলো ও ছায়া ১৩৭
ইতিহাসমালা ১৭, ২০
ইন্দ্র ৫০
ইন্দ্রাণী ৩২
ইয়ং বেঙ্গল দল ১১৭
ইসলাম ধর্ম্ম ৯০
ঈশোপনিষৎ ২০
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ২১, ১৩১
উইলিয়াম কেরী ১৬, ১৯
উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক (লর্ড) ১২৭, ১২৮
উইলিয়ম হকিন্‌স্ ৮৪
উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার ২০
উদ্বাহ তত্ত্ব ৭৫
উর্বশী ৩৩-৩৭
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫৩
ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ১২৫
ঔশিজ ৪৪
কক্ষীবান ৩২, ৪৩, ৪৪
কথামালা ২৫
কথোপকথন ১৭. ২০
কমছ্যু. ৪৩
কর্ণওয়ালিস (লর্ড) ১৩
কর্ণাট ৬৩
কলিকাতা ১২৬
কলিকাতা কমলালয় ২৪
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১, ১৩, ১২
কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ১১০
কলিবর্জ্য ৯৪
কবিকঙ্কণ চণ্ডী ৯৬
কহ্লন ৭০
ক্যাম্বেল (ছোট লাট) ১৩৫
কাত্যায়ন-স্মৃতি ৭৩
কাত্যায়নী ৫৯
কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৮
কাদম্বিনী বসু ১২৪
কানে (মহামহোপাধ্যায়) ৮৩
কাব্যমীমাংসা ৬৫
কামসূত্র ৬৩, ৬৪, ৬৫
কামিনী রায় ১৩৭
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর (মহারাজা) ১২৮
কালীনাথ চৌধুরী ১২৯
কালীপ্রসন্ন সিংহ ২৫
কাবষ ৪৪
কাশ্মীর ৭০, ৮৫
কাশিমবাজার ১২৬
কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১১৫
কুল্লূক ৬২
কুক (মিস্) ১১০
কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ৮, ৯
কৃষ্ণচন্দ্র (মহারাজা) ৮৮, ১৩০
কেরী ১৭, ২৩
কেশবচন্দ্র সেন ১১৯, ১২১, ১২২, ১২৩
কোচবিহার ১০, ১৩
কৌটুম্বিক ভার্য্যা ৬৩
খনা ১১৩
খলিফা হারুণ অল্ রসীদ ৬৪
খুলনা ৯৫, ৯৬
খেতুড়ি ৯৭
চণ্ডীদাস ২, ৩
চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার ১১০
চন্দ্রমুখী বসু ১২৪
চর্যাপদ ২
চরিতাবলী ২৫
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩
চালুক্য বংশ ৭০
চাহমান বংশ ৭০

চিত্রলেখা ১১৩
চুকামফা স্বর্গদেব ১০
চৌলুক্য বংশ ৭০
গাঙ্গেয় দেব ৭১
গাথা সপ্তশতী ৬২
গার্গী ৫৮, ৫৯
গাহড়বাল বংশ ৭০
গৃহ্য সূত্র ৫৩, ৫৫
গোপীমোহন দেব ১২৮
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ১১১
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ১১৫, ১১৮
জনক ৫৮
জন স্টুয়ার্ট মিল ১০০
জয় নারায়ণ ঘোষ ৬
জাহ্নবী দেবী ৯৭
জাহাঙ্গীর ৮৪
জীমূতবাহন ৭৩
জ্ঞানাদি সাধনা ৪
জ্ঞানান্বেষণ ১৩৪
ডালহৌসী (লর্ড) ১১৭
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১২৩, ১৩১, ১৩৩
—সভা ১৩১
তলবকার উপনিষৎ ২০
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৯০
ত্রিভুবন মহাদেবী ৭০
থেরী গাথা ৬৬
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১১৭
দণ্ডী মহাদেবী ৭০
দায়ভাগ ৭৩
দ্বারকানাথ ঠাকুর ১২৯
দিগ্‌দর্শন ২৪
দিদ্দা ৭০
দীনেশচন্দ্র সেন ৪
দেবী (কবি) ৬৩
দেবী গোস্বামী ৭০
দেবীবর ঘটক ৭৭
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২২
দ্রবময়ী দেবী ১১০
দ্রৌপদী ৪৩, ১১৩
ধর্মমহাদেবী ৭০
ধর্মশাস্ত্র ৮০
ধর্মসূত্র ৫৩, ৫৫
ধ্রুবানন্দ মিশ্র ৭৭
নন্দকুমার (মহারাজা) ১৩
নন্দিনী ৯৭
নববিবিবিলাস ২৪
নরনারায়ণ (মহারাজা) ১০
নয়নিকা ৭০
নাইকি ৭০
নারদস্মৃতি ৬১
নারায়ণ দাস ৯৮
নিকোলো কণ্টি ৮৩
নিত্যানন্দ ৯৭
নিয়োগ-প্রথা ৫০
'নিরিন্দ্রিয়া' ৬২
'নিষ্কৃতি' ৬৯
নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১
পঞ্চানন মণ্ডল ১৪
পরাশর ৯৩
পর্তুগীজ ৭ ৯
পর্দাপ্রথা ৭২
পহ্ঈ ৬২
পুরুরবা ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬
প্যারীচাঁদ মিত্র ২৫
প্রচেতস্‌ ৪৯
প্রভাবতী ৭০
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১২৯
প্রতাপাদিত্য ৯৩
প্রবোধচন্দ্রিকা ২২
ফুলমণি ১৩৬
ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ২৫
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ১৬, ১৭, ২০, ২১, ২৩
ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া ১১৮
বকুল মহাদেবী ৭০
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৬, ১৩৫
বত্রিশ সিংহাসন ১৭, ১৮
বন্ধুবহী ৬২
'বন্ধুবর্গ সমবায়' বা সুহৃদ্‌ সমিতি ১৩৪
বল্লাল সেন ৭৬
বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র ৫৬, ৯২
বসুক্র ৩২
বহু বিবাহ ১৩৪
বাক্‌ (ঋষি) ৩৭

বাকাটক বংশ ৭০
বাংলা-ইংরেজী অভিধান ১৭
বাঙ্গাল গেজেট ২৪
বাচক্নবী ৫৮
বাচস্পতি মিশ্র ৭৬
বাৎস্যায়ন ৬৩. ৬৪, ৬৫
বামাবোধিনী পত্রিকা ১১৮
বামাহিতৈষিণী সভা ১২৩
বারাণসী ৮৪
বার্ণিয়ের ৮৪
বাষ্কী ৪৯
বিজয় ভট্টারিকা ৭০
বিজয়াঙ্কা ৬৩
বিজ্ঞানেশ্বর ৭৪
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১২৩
বিদ্যাসাগর ১, ২৫, ২৬, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২১, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫
বিদ্যাসাগর পেড়ে শাড়ী ১৩১
বিমদ ১৪
বিশ্বভারতী ৪৩
বুরহানপুর ৮৪
বৃদ্ধহারীত ৮০, ৮৬
বৃন্দাবনলীলা ৫
বৃহদ্দেবতা ৪০
বৃহদারণ্যক ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩
বৃহস্পতি ধর্মশাস্ত্র ৯০
বেরিলী ১২৬
বেদান্তচন্দ্রিকা ২২
বেদান্তসার ২০
বেতাল পঞ্চবিংশতি ২৫
বেথুন ১১৬, ১১৭
—কলেজ ১১৬—স্কুল১১৭, ১১৮, ১১৯
বেহরামজী মেরবানজী মালাবারি ১৩৬
বেণ্টিঙ্ক (লর্ড) ১৩০
বৌধায়ন ধর্মসূত্র ৫৫
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩, ২৪
ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ ৮
ব্রাহ্মণ সেবধি ২৪
ব্রাহ্ম সমাজ ১১৮, ১২০, ১২২

ভট্টাচার্যের সহিত বিচার ২০
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪
ভবানী (রাণী) ১১৩, ১১৪
ভাওয়াল ৯
'ভারতী' ১৩৭
ভাষাপরিচ্ছেদ ৪
ভিক্টোরিয়া (মহারাণী) ১৩৬
ভূষণা ৮

মগ ৮
মণ্ডন মিশ্র ৬১
মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১১৫, ১১৭
মনুসংহিতা (স্মৃতি) ৬১, ৬৭ ৬৯. ৭০. ৭১, ৯২
মহাভারত ৪১, ৪৯, ৫৩, ৯১
মহাভাষ্য ৫৭. ৫৮
ম্যানোয়েল দা অসুম্পশাও ৮, ৯
ম্যানুয়েল দো বোজারিও ৮
মাধবী ৬২
মিতাক্ষরা ৯৪
মুদ্গল ৪১
মুদ্গলানী ৪১
মূলরাজ (দ্বিতীয়) ৭০
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৭, ১৮, ২২
মেরী কারপেণ্টার (মিস্) ১১৯
মৈত্রায়নী সংহিতা ৫৩. ৫৬
মৈত্রেয়ী ৫৯, ১১৩

যম ৩৩, ৩৪, ৪১
যমী ৩৩, ৩৪, ৪১
যাজ্ঞবল্ক্য ৫৮, ৫৯, ৭৩ —স্মৃতি ৯৪

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ৭৫, ৮৬, ৮৭
রবীন্দ্রনাথ ৬৯. ৮১
রমাই পণ্ডিত ৩
রাঘবানন্দ ৬২
রাজশেখর ৬২, ৬৩
রাজতরঙ্গিনী ৭০
রাজবল্লভ ৮৮, ১৩০
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ১৭
রাজাবাল ১৭, ১৮
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ১৭, ১৯
রাজোপাখ্যান ৬
রাধাকান্ত দেব (রাজা) ১২৮, ১৩২
রামরাম বসু ১৬, ১৭
রামকান্ত ঠাকুর ১১
রামকমল সেন (দেওয়ান) ২৩
রামগোপাল ঘোষ ১১৭
রামমোহন রায় ২০-২৩, ১০৪, ১০৫, ১২৮, ১২৯
রামায়ণ ৫৩
রালফ ফিচ ৮৪

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৩৪
রিপণ (লর্ড) ১৩৭
রুক্মিণী ১১৩
রূপ গোস্বামী ৩
রূপ গোস্বামী কারিকা ৩, ১০
রূপমঞ্জরী ৯৭, ৯৮
'রূষা' ৬৪
রোদসী ৪৮
রোমশা ৩২
রোহা ৬২

লক্ষ্মণ সেন ৭৭
লাট ৬৩
লিপিমালা ১৭
লীলাবতী ১১৩
লোকনাথ মল্লিক ১১০
লোপামুদ্রা ৩২

শতপথ ব্রাহ্মণ ৫৬, ৫৭, ৯০
শঙ্করদিগ্বিজয় ৬১
শঙ্করাচার্য ৬০, ৬১
শঙ্খ-স্মৃতি ৮০
শশীপ্রভা ৬২
শিবচন্দ্র রায় (রাজা) ১০৯
শিবনাথ শাস্ত্রী ১২৩
শীল ভট্টারিকা ৬৩
'শুক্তি মুক্তাবলী' ৬২
শূন্যপুরাণ ৩
শ্যাবাশ্ব ৩৯
শ্যামাচরণ দাস ১৩১
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ৭৯
শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী ১১৩, ১১৪
শ্রীচৈতন্য ৭, ৯৭
শ্রীনিবাস আচার্য ৯৭
শ্রীপুর ৭
শ্রীরামপুর ১৬
শ্রীশচন্দ্র (রাজা) ১৩০, ১৩১

সতী ৮৪
সতীদাহ ১২৫, ১২৮-১৩০
সতীপ্রথা ১২৭, ১৩৪
সমন ৪২
সম্বাদ কৌমুদী ২৪
সম্বাদ ভাস্কর ১১৫
সমাচার চন্দ্রিকা ২৪, ১১৩
সমাচার দর্পণ ২৪, ১০৫, ১১৩, ১২৯
সমীকরণ ৭৭
সরলা দেবী ১৩৭
সর্বশুভকরী পত্রিকা ১১৫
সহমরণ ৮০-৮৬, ১০৫, ১২৫-১২৮, ১৩২
সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ ১২৭
সাতবাহন ৭০
সায়নাচার্য ৪৮
সিকন্দর (সুলতান) ৮৫
সিরাজউদ্দৌল্লা ৮৮
সিল্লা ৭০
সীতা ৪৩
সীতার বনবাস ২৫
সীতা দেবী ৯৭
সুখময় রায় (মহারাজা) ১০৯
সুগন্ধা ৭০
সুকুমার সেন ২১, ২২, ২৩
সুপ্রীম কোর্ট ১২৫
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৭
সুরেন্দ্রনাথ সেন ৮, ১৩
সুশীলকুমার দে ২৩
সূর্যমতী ৭০
সোমপ্রকাশ পত্রিকা ১১৯, ১২১
স্বর্ণকুমারী দেবী ১৩৭, ১৩৮
স্কন্দপুরাণ ৮৫
স্কুল বুক সোসাইটি ১১৪
স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক ১১১

হটী বিদ্যালঙ্কার ৯৭, ১১৩, ১১৪
হরসুন্দরী ১০৯
হরি মাইতি ১৩৬
হরিমোহন ১৪
হানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্স ২৫
হারুণ অল্ রসিদ ৬৪
হিন্দু ইনটেলিজেন্সার ১১৫
হিন্দু মেলা ১৩৭
হিরণ্ময়ী দেবী ১৩৭
হুতোম প্যাঁচার নক্সা ২৫
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫
হেমলতা ৯৭
হ্যামিল্টন বুকানান ৮৩